নিরীক্ষা

এপ্রিল-জুন ২০২৪

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৫০তম সংখ্যা

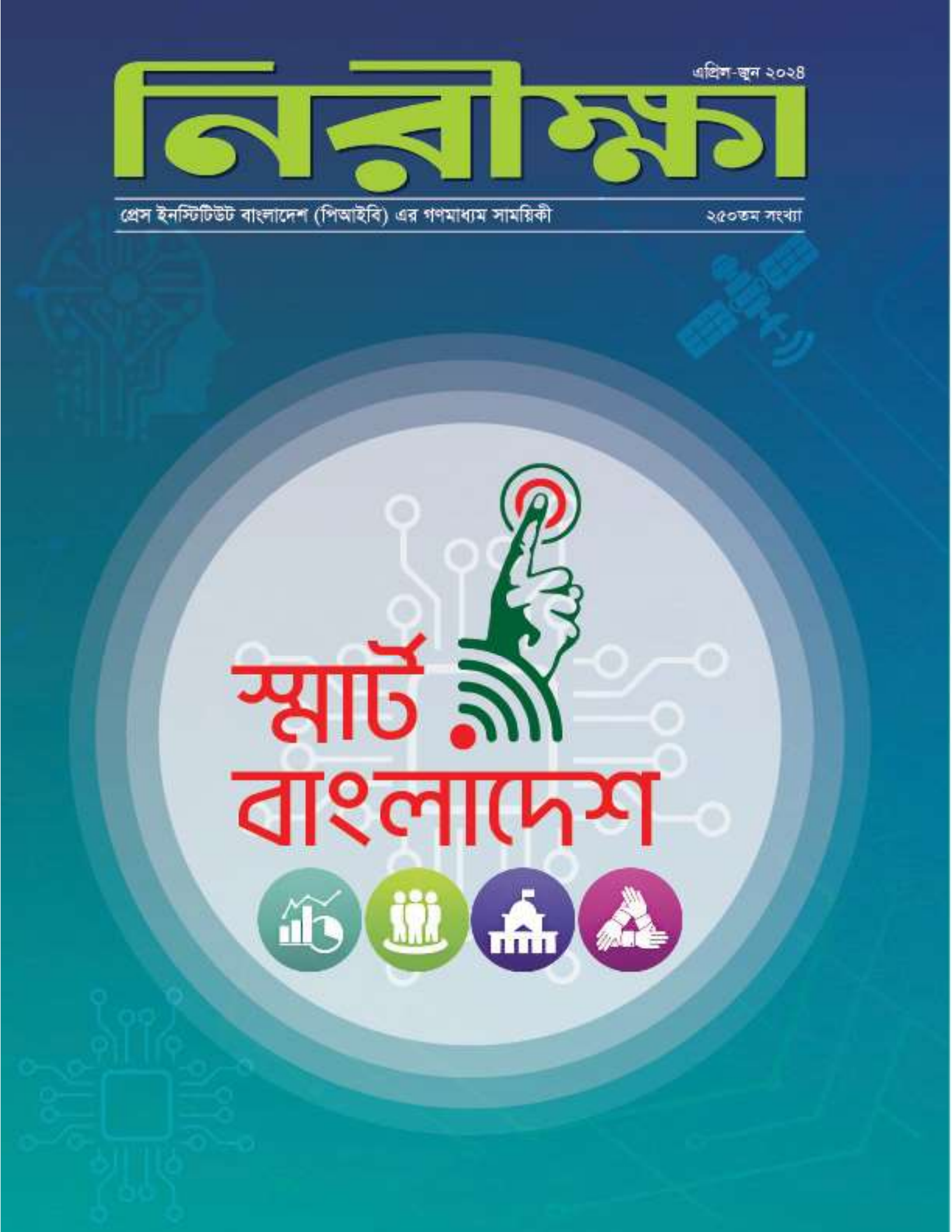

নিরীক্ষা

২৫০তম সংখ্যা: এপ্রিল-জুন ২০২৪

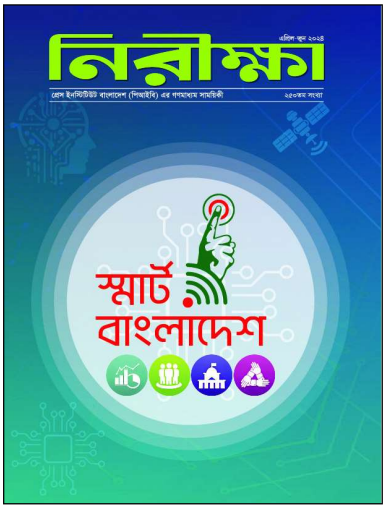

দিনবদলের সনদ নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার, হাঁটি হাঁটি পা পা করে সেটি আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন জয় করে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে। ইতোমধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে রাষ্ট্রের সব সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়নের পর এবার নতুন লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি–এ চারটি মূল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশের সূচনাপথে অর্থাৎ ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' উদ্‌যাপনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব।' প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের বাস্তবতার নিরিখে বলতে হয়, দেশে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা পুরোপুরি দৃশ্যমান। অধিকাংশ সরকারি সেবাই এখন প্রযুক্তিনির্ভর এবং হাতের মুঠোয়। স্মার্ট সমাজব্যবস্থা এখন আর স্বপ্ন নয়। আর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে এর রোডম্যাপ, পলিসি, অবকাঠামোয় নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে অটোমেশনের ছোঁয়া লেগেছে। নতুন নতুন হাই-টেক পার্ক গড়ে উঠছে। আর সেসবের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেও। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের এখন যে রপ্তানি, এক দশক আগেও তা ভাবা যেত না। কার্যত স্মার্ট বাংলাদেশ হলো জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি গঠনেরই রূপকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোর সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সরকার। এক্ষেত্রে ইতিবাচক লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ায় উদ্ভাবন ও গবেষণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে উদ্ভাবন ও গবেষণাকে। বাংলাদেশ শ্রম-নির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। তাই বিবেচনা করতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টিও। আমরা মনে করি, শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে। গণমাধ্যমকেও হয়ে উঠতে হবে স্মার্ট। এক্ষেত্রে প্রস্তুতির ধারাকে নিতে হবে এগিয়ে।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি দক্ষ জনগণের সরকার গড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। এককথায় স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছেন তিনি। এই লক্ষ্যে ভিত্তিগুলো কী হবে, সে ধারণাও স্পষ্ট করেছেন। জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করে পিতার স্বপ্নপূরণে একধাপ এগিয়েছেন। এবার স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে কাজ চলছে। সেই অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষার 'স্মার্ট বাংলাদেশ'–বিশেষ এই সংখ্যাটির উপস্থাপন। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারের এ মহৎ কাজে পাশে থাকার সুযোগ পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ। সংখ্যাটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' সম্পর্কে পাঠকের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রটি সম্প্রসারিত করবে বলেই বিশ্বাস করি।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

কম্পিউটার বিন্যাস
শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রকাশকাল: জুন ২০২৪

মূল্য: ৫০ টাকা

ISBN: 978-984-35-4812-2

সূচিপত্র

স্মার্ট বাংলাদেশ: সমতা ও সমৃদ্ধির পথে অভিযাত্রা ৩
আনীর চৌধুরী

স্মার্ট বাংলাদেশের ছবি ৬
মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক: একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন ৯
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন

স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সিভিল সার্ভিস ১১
মো. মঈনুল হাসান চৌধুরী

স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট বাংলাদেশ: রূপকল্প ২০৪১ ১৪
প্রফেসর ড. ফরহাদ রাব্বি

স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প পর্যালোচনা টেকসই অগ্রগতির জন্য স্মার্ট সোসাইটি ১৭
কাজী মোহাম্মদ সালাতুজ্জামান

সুপরিকল্পনা ও নীতি সহায়তার ওপর গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ ২১
রণজিৎ কুমার

ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের চাবিকাঠি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ২৩
ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর

২৯ সাংবাদিকতার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)
ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ

৩১ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইনগত সংস্কার ও উদ্ভাবন
এ কে এম শাহনেওয়াজ চৌধুরী

৩৫ স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাইবার নিরাপত্তা
এস. এম. আশরাফুজ্জামান

৩৮ স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি
ইঞ্জিনিয়ার রিংকো কবিরাজ

৪২ স্মার্ট বাংলাদেশ রূপায়ণে গণমাধ্যমের ভূমিকা
এএইচএম বজলুর রহমান

৪৬ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেধাসম্পদের গুরুত্ব
জাফর রাজা চৌধুরী

৫০ স্মার্ট সংবাদমাধ্যমের স্মার্ট প্রক্রিয়া
জাফর ওয়াজেদ

৫৩ গণমাধ্যম সংবাদ

৬৪ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র সকল প্রকাশনা পেতে: প্রকাশনা কর্মকর্তা পিআইবি, বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম
অনলাইনে: www.rokomari.com; মোবাইল: ০১৯১৩০২৪১৫১

মূল্য ৫০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ০২-৪১০৩২৯১৩, ০২-৪১০৩২৯২৫-২৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৪১০৩২৯১৪
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ: সমতা ও সমৃদ্ধির পথে অভিযাত্রা

আনীর চৌধুরী

স্মার্ট বাংলাদেশ আসলে কী?

এটা কি শুধুই প্রযুক্তিনির্ভর হবে?

এর সুবিধা আমরা কীভাবে পাব?

কাগজপত্র, টাকাপয়সা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ কি আর থাকবে না?

মানুষ থাকবে কি?

স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে এমন অনেক প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনার মাথায় এসেছে। আমার মাথায়ও এসেছে। যেহেতু স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিদিন কাজ করতে হচ্ছে, উত্তরও খুঁজতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মজার বিষয় হচ্ছে, এ প্রতিটি প্রশ্নেরই সম্ভাব্য উত্তর একাধিক। এরকমও হতে পারে–আমার ও আপনার উত্তর নাও মিলতে পারে। তবে গন্তব্য এক। সেটি হচ্ছে ২০৪১-এর সমতা ও সমৃদ্ধির স্মার্ট বাংলাদেশ।

এই সুযোগে আমার ভাবনাটা বলি।

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে যতটা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা ভাবি, এর থেকেও এটি বেশি ধারণ করে একটি আদর্শ, একটি দর্শন। যার মূলে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি সব সেবা খুব সহজ ও সুলভে পাওয়ার নিশ্চয়তা, রয়েছে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার অন্তর্ভুক্তির সহজ সমাধান, রয়েছে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ মানস গঠনের অবিরাম স্বপ্ন। এ দর্শন শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলে না; বলে অগ্রসর প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা, বলে ব্যক্তির মানস গঠনের উন্নয়ন ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের কথা।

স্মার্ট বাংলাদেশের দর্শন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের মহান স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতৃত্বগুণের অধিকারী। মহান স্বাধীনতার প্রায় ২৪ বছর আগে দেশবিভাগেরও আগে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। জাতির পিতার রাজনৈতিক মুক্তির দর্শনের ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির দর্শনকে বাস্তবায়িত করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের; যা মূলত বঙ্গবন্ধুর সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির দর্শন।

২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ়প্রত্যয়। এ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ–স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থা। স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আমি তাই এমন এক বাংলাদেশকে বুঝি, যেখানে:

- আপনি এবং আমি যে কোনো সমস্যা সমাধানে নিজেরাই উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেব, জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সবাই একাত্ম হয়ে এগিয়ে যাব।
- প্রত্যেক ব্যক্তি ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান যত ছোটোই হোক, যেখানেই থাকুক, যত সীমিত দক্ষতা ও ক্ষমতার অধিকারীই হোক–আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করব।
- সব সময় দৃশ্যমান না হয়েও যেখানে-যখন আমার বা আপনার দরকার, সেখানেই সেবা প্রদান করবে স্মার্ট সরকার।
- আপনি ও আমি এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলব, যেখানে সব ধরনের বিভেদ ও অসহনশীলতা শূন্যের কোঠায় পৌঁছাবে।

স্মার্ট নাগরিক:

একের উদ্ভাবন কিন্তু সমাধান সবার (#IamtheSolution)

আমরা আল নাহিয়ানের কথা বলতে পারি। সেই নাহিয়ান, যাকে সবাই রকেটম্যান হিসাবে চেনে। কিন্তু একদিনেই তো আর সে রকেটম্যান হয়ে ওঠেনি। ছোটোবেলায় টেলিভিশনের পর্দায় প্রথম রকেট ওড়ার দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়েছিল সে। এরপর থেকেই তার রকেট ওড়ানোর স্বপ্ন দেখা শুরু।

২০১২ সালে ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে নিজের অদম্য স্বপ্নপূরণে নেমে পড়ে নাহিয়ান। কোনোকিছু না ভেবেই বন্ধুদের নিয়ে রকেট তৈরির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেনি, কেননা ততদিনে তার জানা হয়ে গেছে রকেট বানাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। বন্ধুরা একে একে চলে যায়, থেমে থাকে উদ্যম। কিন্তু দমে যায়নি নাহিয়ান। নিজেকে তৈরি করে ধীরে ধীরে। আরও বন্ধুরা আসে। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ২০১৮ সালে তৈরি করে ফেলে 'ধূমকেতু এক্স'। খুব বড়ো সফলতা না এলেও চারদিক সাড়া পড়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে এটুআই প্রোগ্রামের 'রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ'-এ অংশ নিয়ে প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় নাহিয়ানদের 'ধূমকেতু'! তৈরি হয় দেশের প্রথম ওয়েদার রিসার্চ রকেট (সাউন্ডিং রকেট)।

নাহিয়ানের এ ধূমকেতু শুধু তারই স্বপ্নপূরণ করে না, স্মার্ট বাংলাদেশের দর্শনকেও সহজে বুঝতে সাহায্য করে। একজন উদ্ভাবনী চিন্তা করছেন, তার চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসছে; চিন্তার বাস্তবায়ন করে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ। এখানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এবং জাতিগঠনে সব নাগরিকই সমানভাবে অবদান রাখতে পারবে। সমাজের সব সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি খাত একত্রে ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ সবাই মিলে সবার জন্য উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে। নাহিয়ানের মতো সমস্যা সমাধানে নিজে থেকেই উদ্যোগী হবে আগামীর স্মার্ট নাগরিক। যেখানে নাগরিকদের সবাই হবেন বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক। যেখানে একের উদ্ভাবনে সবার সমস্যার সমাধান হবে, এমনকি তারা সমস্যাকে পরিণত করবেন সম্ভাবনায়।

স্মার্ট অর্থনীতি:

আর্থিক ক্ষমতায়ন ও ক্যাশলেস অর্থনীতি (#CircularCashless)

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রানী ঢাকা শহরের মতিঝিলে থাকেন প্রায় ১০ বছর। স্বামীর একার উপার্জনে সংসার চলে না বলে নিজেই উদ্যমী হয়ে শুরু করেন মুদি দোকান। রানী খেয়াল করেন নিয়মিত গ্রাহকের বাইরেও ভাসমান অনেকেই খুচরা টাকা নেই বলে চলে যায়, অনেকে পরে দেবে বলেও তাদের আর এদিকে পাওয়া যায় না। এভাবে প্রায়ই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো তাঁকে। এ সমস্যার সমাধানে কিউআর কোড দিয়ে ছোটো-বড়ো যে কোনো অঙ্কের টাকা নেওয়া শুরু করেন। ডিজিটাল এ লেনদেন চালু করার পর খুচরা টাকা নেই বলে কেউ আর চলে যেতে পারেন না। শুধু রানী নন, পান দোকানি থেকে ফল বিক্রেতাসহ বাংলাদেশের ছোটোখাটো অনেক দোকানদার এখন ক্যাশলেস লেনদেন করেন।

এ পরিবর্তন শুধু লেনদেনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি স্মার্ট বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির লক্ষ্য পূরণ করে এবং কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) আর্থিক সক্ষমতারও বার্তা দেয়। কেননা দেশের অর্থনীতির একটি বড়ো অংশেই রয়েছেন সিএমএসএমই উদ্যোক্তারা। তাঁদের জন্য তৈরি হচ্ছে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার, যেটি শুধু ফিজিক্যাল কোনো সার্ভিস সেন্টারই নয় বরং অনলাইনে যে কোনো জায়গা থেকে যেন উদ্যোক্তারা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য, নিবন্ধন, আর্থিক সহযোগিতা, দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি মার্কেটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সব সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

রানীর মতো দেশের লাখো মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের আর্থিক লেনদেনের চেহারাই বদলে দিচ্ছেন। এতে লেনদেন হচ্ছে ক্যাশলেস। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্সের ব্যবহার হবে কৃষি, শিল্প, সেবা–সব খাতে; সম্পদের ব্যবহার হবে সুষ্ঠু; কমবে অপচয় এবং বাড়বে উৎপাদনশীলতা। প্রসারিত ও বৈচিত্র্যমূলক হবে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার। তথ্যপ্রযুক্তি সহযোগে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত; সহজে করা যাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠবে দক্ষ। ফলে স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম স্তম্ভ স্মার্ট অর্থনীতি হয়ে উঠবে জ্ঞানভিত্তিক, সার্কুলার, উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর।

স্মার্ট সরকার:

সরকারি কর্মকর্তার উদ্ভাবনী মানসিকতা (#Govpreneur)

স্থানীয় সরকারের এক কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মালেক। এলাকার কৃষকদের ফসল ফলনে ব্যর্থতা ও কষ্ট দেখে চিন্তিত ছিলেন। ২০১৪ সালে সরকারের 'এমপ্যাথি ট্রেনিং প্রোগ্রাম'-এ যোগ দিয়ে শেখেন কীভাবে প্রযুক্তির সহযোগিতায় স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা যায়।

এভাবেই 'কৃষকের জানালা' নামে একটি উদ্ভাবনী অ্যাপের জন্ম হয়। এ অ্যাপের সহযোগিতায় ফসলের ছবি দেখেই কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে শস্যের রোগবালাই শনাক্ত করতে পারেন। কৃষকদের উপকারে আসতে থাকা এ অ্যাপ পাইলটিং করার পর এখন সরকারের কৃষি সহায়তা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

'কৃষকের জানালা'র মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো আব্দুল মালেকের মতো 'গভপ্রেনার' তৈরি করবে। গভপ্রেনার তারাই, যারা সরকারি কর্মকর্তা হয়েও সেবা সহজীকরণ ও সেবাকে জনবান্ধব করে তুলতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেন না।

স্মার্ট বাংলাদেশে সব কর্মকর্তাই গড়ে উঠবেন একেকজন গভপ্রেনার হিসাবে। তাঁরা উদ্যোক্তার মতো করে ভাববেন, উদ্যোক্তার মতো স্থান ও পরীক্ষামূলক কাজ করার স্বাধীনতা নেবেন। সেই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে শুধু জনগণের সমস্যার সমাধানই করবেন না, বরং সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতেও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। ফলে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সরকার হবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর। হবে নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। সরকারের সব কার্যক্রম হবে কাগজবিহীন, উপাত্তনির্ভর, আন্তঃসংযুক্ত, সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয়। এসব জনবান্ধব সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, উপাত্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর হবে। সরকার সব সময় দৃশ্যমান হবে না, তবে যেখানে যখন দরকার, সেখানে থাকবে স্মার্ট সরকার।

স্মার্ট সমাজব্যবস্থা:

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থায় সবাই আপন (#ZeroDigitalDivide)

অপরাজিতা (ছদ্মনাম)। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। সাধারণত টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে অনেক সময়েই ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসাসেবা নেন, অভিজ্ঞতাও ভালো। কিন্তু হঠাৎই একবার ঘটে বিপত্তি। সহপাঠী বন্ধুর অনলাইনে মিউচুয়াল দেখে এক ডাক্তারের কাছে সেবা নেন। এর কিছুদিন পর সেই ডাক্তার তাঁর কিছু ছবি ও ভিডিয়ো ক্লিপ দিয়ে হয়রানি শুরু করেন। প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতা নিয়ে সময় যাচ্ছিল তাঁর, আত্মহত্যার কথাও ভেবেছেন। এরই মধ্যে সাইবার টিনস-এর কার্যক্রম বিষয়ে জানতে পেরে তাদের সহযোগিতা নেন তিনি। দেশের সাইবার স্পেসে সংঘটিত নানা অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করা সাইবার টিনস প্রথমে তাকে কাউন্সেলিং দেয় এবং পরে ফেক আইডি থেকে ভুয়া ডাক্তারকে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। তাদের পরামর্শে স্থানীয় থানায় একটি সাধারণ ডায়ারি করেন অপরাজিতা। পুলিশের সহায়তায় সেই হয়রানিকারীকে শনাক্ত করা হয় এবং আইনের আওতায় নেওয়া হয়। জানা যায়, ডাক্তার পরিচয়ে লোকটি বেশ কিছুদিন ধরেই এ ধরনের প্রতারণামূলক কাজ করে আসছিল।

অনলাইনমাধ্যম যেমন বিপুল সম্ভাবনাময়, তেমনই একটু অসচেতনতায় হয়ে উঠতে পারে ভীতিকর। এটি অনেকটা শাঁখের করাতের মতো। এতে উপকারিতা যেমন আছে, আছে অপকারিতা ও ব্যাপক ক্ষতির ঝুঁকি। অপরাজিতার অভিজ্ঞতা থেকে অনলাইনমাধ্যমের ঝুঁকি এবং দ্রুত ভূমিকা নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তির ক্ষতিকর আশঙ্কা প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যেখানে ব্যক্তির প্রয়োজনে ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে তৎপর থাকবে।

এভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সম্পূর্ণরূপে জনমুখী, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত। অপরাজিতা, সাইবার টিনস কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মতো সব জনগণই স্মার্ট সমাজের অবিচ্ছেদ্য সদস্য। সঠিক তথ্যপ্রবাহের ফলে কমে যাবে ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অনৈতিক সুযোগ গ্রহণ। প্রযুক্তি ব্যবহারে সংস্কৃতিচর্চা, বিনোদন ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের সময় ও সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

এ পরিবর্তনকেই আমরা বলতে পারি চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা। 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড' বা 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়'–এ কথাটিকে প্রায়ই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর মানে কিন্তু প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘুদের সাহায্য প্রদান করা নয়। বরং নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সবাইকে সমানভাবে সক্ষম করে তোলার সব উপায় থাকবে এবং যে কোনো বাধা কারও দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। এটি হবে এমন এক সমাজ, যেখানে সবাই সত্যিকার অর্থে এমনভাবে সমান হয়ে উঠবেন যে, আলাদা করে কাউকেই সহনশীল হয়ে ওঠার প্রয়োজন হবে না! কারণ, ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে শতভাগ।

আমিই সল্যুশন মানসিকতার বিকাশ (#IamtheSolution)

নাহিয়ান, রানী কিংবা আব্দুল মালেক–তারা সবাই একেকজন স্মার্ট নাগরিক, যাঁরা নিজেরাই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেন, স্বপ্ন দেখেন সমাধানের এবং একটা দৃঢ়সংকল্প বাস্তবায়ন করার মতো করে অর্জন করেন সমাধান। যা কিনা শুধু তাঁর নিজের জন্যই না, সমাজের অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করে একেকজন স্মার্ট নাগরিক হয়ে ওঠার সাহস দেয়, সংকল্প তৈরি করে।

এটি এমন একটি দেশ, যাঁরা পিছিয়ে আছেন তাঁদের এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির দ্বার উন্মোচন করে সবার সমান সুযোগ ও সুবিধার নিশ্চয়তা দেয়। এ বাংলাদেশ এমন একটি দেশ ও জনপদের কথা বলে, যেখানে সরকারি, বেসরকারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্বকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে। বিগত ১৬ বছরের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এমন একটি দেশ গড়ে তোলা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

১৬ বছর আগে বিভাগীয় শহরগুলোয় যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা ছিল, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের পর তার সবকিছুই আজ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পাওয়া যায়। শহরের সব সুযোগ-সুবিধা এখন পাওয়া যায় দেশের প্রতিটি গ্রামে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট; যাতায়াতব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এখন সবার হাতের মুঠোয়। ফলে জেলায় জেলায় তৈরি হচ্ছেন একেকজন নাহিয়ান, একেকজন স্মার্ট নাগরিক। এ স্মার্ট নাগরিকদের উদ্ভাবনী চিন্তা, উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয়-জাতীয় সমস্যার যেমন সমাধান হচ্ছে, ঠিক একইভাবে অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হয়ে যার যার ভূমিকায় কাজ করছেন, গড়ে উঠছে একেকটা স্মার্ট সমাজ। যেখানে প্রযুক্তির কল্যাণে অর্থনীতি হয়ে উঠছে ক্যাশলেস, সরকারি কর্মকর্তারা হয়ে উঠছেন একেকজন গভপ্রেনার। গড়ে উঠছে স্মার্ট বাংলাদেশ।

এই স্মার্ট বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের আধুনিক রূপ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৩ সালের ৩ আগস্ট স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় ২০৪১ সালের লক্ষ্যপূরণে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আমরা বুঝতে পারি এ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী, টেকসই ও উন্নত। ইতোমধ্যে নানামুখী উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী চিন্তার সমন্বয়ে সবাই যার যার জায়গা থেকে ভূমিকা পালন শুরু করেছে। সরকারের সব মন্ত্রণালয় থেকে ৫৩টি কুইক উইন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা দ্রুত জনবান্ধব সেবা প্রদানে সক্ষম এবং যেগুলো খুব কম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য।

স্মার্ট বাংলাদেশ একদিনে হবে না। প্রতিদিনের পথচলায় ধাপে ধাপে এর লক্ষ্যপূরণে আমাকে ও আপনাকে কাজ করে যেতে হবে। যেভাবে আমরা একাত্ম হয়েছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের সূচনা করতে ১৯৭১ সালে, অন্তর্ভুক্তিমূলক মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ২০২১ সালে, ঠিক সেভাবেই সমতা ও সমৃদ্ধির স্মার্ট বাংলাদেশ আপনি ও আমি মিলে গড়ে তুলব ২০৪১ সালের মধ্যে।

আমি এভাবে ভাবছি। আপনি কীভাবে ভাবছেন? আপনার ভাবনা শেয়ার করতে পারেন আমাদের সঙ্গে communication@a2i.gov.bd (ইমেইল ঠিকানা)।

লেখক: পলিসি অ্যাডভাইজার, এসপায়ার টু ইনোভেট-এটুআই প্রোগ্রাম,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ,
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ইউএনডিপি বাংলাদেশ পরিচালিত

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশের ছবি

মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের ঘোষণার পর এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অনেকেই বলে আসছিলেন–স্মার্ট বাংলাদেশের সামগ্রিক বিষয়টি সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে তুলে ধরা প্রয়োজন, যেন সবাই এর একটি স্পষ্ট ছবি আঁকতে পারেন। এছাড়া সময়-সময় এ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে। যেমন: 'স্মার্ট'-এর মানে কী? ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কি শেষ? ডিজিটাল এবং স্মার্ট বাংলাদেশের মধ্যে মূল পার্থক্য কী? একটি সেবাকে আমরা কখন স্মার্ট বলব? আমরা আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে কোন ধরনের বাংলাদেশের কথা বলছি? স্মার্ট বাংলাদেশ মানে কি শুধুই প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ? এ প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখেই আজকের এ লেখা।

এক.

প্রথমেই আসা যাক আমরা স্মার্টনেস বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝি? একজন মানুষকে আমরা তখনই স্মার্ট বলি, যদি তিনি হন চটপটে কিংবা করিতকর্মা আর তিনি যদি বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন কাজ দ্রুত সময়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করতে পারেন। কিন্তু দেশ তো আর ব্যক্তি নয়। তাহলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্মার্টনেসের সংজ্ঞা কী? আসলে স্মার্ট দেশের কথা বললে আমাদের মনে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আসে তা হলো–এমন একটি দেশ, যেখানে কাজকর্ম খুব দ্রুত, দক্ষ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাকমতো হয়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, পৃথিবীর যে দেশগুলো নিজেদের স্মার্ট দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছে, সেসব দেশে

কাজের গতি ও উৎপাদনশীলতা স্মার্ট নয়–এমন দেশ থেকে অনেকগুণ বেশি। আর এ কাজের গতি বৃদ্ধিতে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তথ্যপ্রযুক্তি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প ঘোষণাকালে এর একটি রূপরেখা দিয়েছিলেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী, টেকসই ও উন্নত। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভও নির্ধারণ করে দেন। স্তম্ভগুলো হলো: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থা। পরে ২০২৩ সালের ৩ আগস্ট স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের কিছু বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের চেহারা বা অবয়ব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

যেমন: একজন নাগরিককে স্মার্ট হতে হলে তাকে বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হতে হবে এবং তাকে সমস্যা সমাধানের মানসিকতাসম্পন্ন সুনাগরিক হতে হবে। অন্যদিকে আমাদের অর্থনীতিকে আমরা তখনই স্মার্ট বলব, এটি যদি হয় ক্যাশলেস, সার্কুলার, উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর ও জ্ঞানভিত্তিক। পাশাপাশি সরকারব্যবস্থা তখনই স্মার্ট হবে, যদি এটি হয় নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, কাগজবিহীন (paperless), উপাত্তনির্ভর (data driven), আন্তসংযুক্ত (interconnected), ইন্টারঅপারেবল, সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয়। এছাড়া সমাজব্যবস্থা স্মার্ট হবে যদি এটি হয় বৈষম্যমুক্ত (Zero Divide), অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive), ন্যায়ভিত্তিক, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, সহনশীল ও নিরাপদ।

দুই.

অনেকেই এ প্রশ্নটি করে থাকেন–ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কি শেষ? ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ–এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে; যেমনটি হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বেলায়। তাহলে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল উপাদান বা অগ্রাধিকার ছিল কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো, ই-গভর্নমেন্ট, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন ও দক্ষ মানবসম্পদ। অন্যদিকে স্মার্ট বাংলাদেশের মূল স্তম্ভগুলো হলো স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থা। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণ, অন্যদিকে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল দেশের সর্বত্র আইসিটি অবকাঠামোর সম্প্রসারণ, সেখানে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বশেষ ব্যক্তিটির কাছে আইসিটি অবকাঠামোর সুবিধা অর্থাৎ সাশ্রয়ী ও উচ্চগতির নিরাপদ ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া। ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় আমরা নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়েছি, আর স্মার্ট বাংলাদেশে সেবা হবে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ ব্যক্তির চাহিদামাফিক। ডিজিটাল বাংলাদেশে একজন নাগরিকের একাধিক ডিজিটাল পরিচয় থাকলেও স্মার্ট বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে একটি একক ডিজিটাল পরিচয়। ডিজিটাল বাংলাদেশে সরকারি সেবা পুরোপুরি কাগজবিহীন এবং আর্থিক লেনদেন ক্যাশলেস না হলেও স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হচ্ছে তা পুরোপুরি পেপারলেস ও ক্যাশলেস করা। সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ হবে অধিকতর সমন্বিত, সংযুক্ত, স্বয়ংক্রিয় ও ইন্টারঅপারেবল। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, স্মার্ট বাংলাদেশ হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নততর সংস্করণ, যেখানে অগ্রসর প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিন.

এবার আসা যাক, আমরা স্মার্ট বাংলাদেশকে কীভাবে দেখছি? স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণাটির ব্যাপকতার কারণে ভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশের অবয়ব ভিন্নরূপে ধরা দেবে। যেমন: একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ হতে পারে ভোগান্তি ছাড়া নিজের মতো করে দ্রুত সেবাপ্রাপ্তির অধিকার। একজন সরকারি কর্মচারীর কাছে সেটা হতে পারে অগ্রসর প্রযুক্তি সহায়তাপুষ্ট চমৎকার কর্মপরিবেশ। একজন ছাত্রের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে হয়তো গুণগত শিক্ষালাভ এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযোগী করে নিজেকে তৈরি করার অবারিত সুযোগ। একজন শিক্ষকের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ হতে পারে শিক্ষাদানে অগ্রসর প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নততর গবেষণার সুযোগ। একজন ব্যবসায়ীর কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে ব্যবসায়ের উপযুক্ত পরিবেশ এবং ক্যাশবিহীন লেনদেন। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে তাঁর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও তাঁর মতো করে সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ। একজন কৃষকের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ হলো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

চার.

আমরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশের মূল উপজীব্য কী হতে পারে তা দেখেছি। এবার দেখা যাক সেক্টরভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশের অবয়ব বা চেহারা কেমন? যেমন: শিক্ষা ক্ষেত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সময়োপযোগী পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষায় অগ্রসর প্রযুক্তির ব্যবহার। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তা হতে পারে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শেয়ারড হেলথ রেকর্ড ও স্বাস্থ্যবিমা। কৃষিক্ষেত্রে তা হবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে হবে স্মার্ট গ্রিড ও ক্লিন এনার্জি। পরিবহণ সেক্টরে হবে সমন্বিত ও আধুনিক পরিবহণব্যবস্থা। রাজস্ব সেক্টরে তা হবে প্রযুক্তির সহায়তায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে হবে কাগজবিহীন অফিস ও নাগরিক সেবা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুততা। বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে হবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আদালতের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি রোধ। সংসদের ক্ষেত্রে হবে জাতীয় স্বার্থে গঠনমূলক বিতর্ক, জবাবদিহি এবং আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখী আইন প্রণয়ন। জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে হবে মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি এবং ভোগান্তি ছাড়া আইনগত সহায়তা। আর্থিক খাতের ক্ষেত্রে তা হবে নগদবিহীন লেনদেন ও উদ্যোক্তাবান্ধব নীতি। আইসিটি সেক্টর হবে আধুনিক ও উন্নত অবকাঠামোসম্পন্ন। রপ্তানিতে থাকবে এ সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অবদান আর তৈরি হবে প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ।

পাঁচ.

বর্তমান সরকার বরাবরই বলে আসছে, স্মার্ট বাংলাদেশের সব নাগরিক সেবাই হবে স্মার্ট। কিন্তু সমস্যা হলো, কী সেই বৈশিষ্ট্য, যা থাকলে একটি সেবাকে আমরা স্মার্ট সেবা বলব? বেশির ভাগ স্মার্ট সেবার ক্ষেত্রেই নাগরিককে আবেদন করতে হবে না বরং ওই পরিষেবার জন্য যোগ্য নাগরিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের কাছে সংরক্ষিত তথ্যের

ভিত্তিতে সেবাটি পেয়ে যাবেন। যেসব সেবার জন্য আবেদন আবশ্যক, সেসব ক্ষেত্রেও নাগরিককে একই তথ্য বারবার পূরণ করতে হবে না। একজন নাগরিককে সেবার জন্য ঘুরতে হবে না; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সিস্টেম নাগরিকের চাহিদা বুঝে সম্ভাব্য পরিষেবার জন্য সক্রিয়ভাবে নাগরিকের কাছে হাজির হবে। যে কোনো সেবার আবেদনের পর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা হবে স্বচ্ছ–নাগরিক নিজে থেকে যে কোনো সময় সেবার অবস্থা জানতে পারবেন, পাশাপাশি সিস্টেমও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবার অবস্থা সম্পর্কে জানাবে। স্মার্ট সেবা হবে কাগজবিহীন, ক্যাশবিহীন ও স্বয়ংক্রিয়। প্রতিটি সেবার ডিজাইনে কোনো না কোনো অগ্রসর প্রযুক্তি যথা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি, ব্লকচেইন, স্মার্ট বট প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যা সেবাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য সুখকর অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। সেবা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ অথবা পরামর্শ, নাগরিক তাৎক্ষণিক প্রদান করতে পারবেন অর্থাৎ স্মার্ট সেবা তৈরি হবে নাগরিকের চাহিদা মোতাবেক এবং তাদের পরামর্শক্রমে।

ছয়.

এই সার্বিক আলোচনা থেকে এবার স্মার্ট বাংলাদেশের একটি সামগ্রিক চিত্র আঁকার চেষ্টা করা যাক।

যেমন: অগ্রসর প্রযুক্তি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার। তবে স্মার্ট বাংলাদেশ শুধু প্রযুক্তিনির্ভর হবে না–সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ হবে স্মার্ট বাংলাদেশের প্রাণ। এই বাংলাদেশের সবকিছু হবে সমন্বিত, স্বয়ংক্রিয় ও পারস্পরিক সংযুক্ত–সরকার হবে ফেইসলেস ও কন্টাক্টলেস; তবে যখন যেখানে দরকার, সেখানেই থাকবে সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশের সব উদ্যোগই হবে নাগরিককেন্দ্রিক; অর্থাৎ নাগরিকই সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে–সব কাজকর্ম হবে দ্রুততার সঙ্গে। সব ক্ষেত্রে বাড়বে উৎপাদনশীলতা। সরকারি সেবা হবে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন, ব্যক্তি চাহিদামাফিক ও অগ্রসর প্রযুক্তিসহায়তাপুষ্ট। সরকারি কর্মচারীরা হবেন দক্ষ, উদ্ভাবনী ও ভবিষ্যৎমুখী। স্মার্ট বাংলাদেশে নাগরিকের কোনো না কোনো দক্ষতা থাকবে, তারা হবে সমস্যার সমাধানকারী; সব নাগরিকের একটি একক ডিজিটাল আইডি থাকবে, যার মাধ্যমে সেবাগ্রহণসহ সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে; অর্থনীতি হবে জ্ঞানভিত্তিক, অর্থাৎ কায়িক শ্রমভিত্তিক না হয়ে মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক হবে। পাশাপাশি অর্থনীতিতে সব লেনদেন হবে ক্যাশলেস। স্মার্ট সমাজ হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থাৎ সবার সব কর্মকাণ্ডে যোগ্যতাভিত্তিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। যোগাযোগব্যবস্থা হবে আধুনিক, সংযুক্ত ও সমন্বিত; সব অবকাঠামো হবে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব। দেশে আধুনিক প্রযুক্তিগত অবকাঠামো থাকবে। উচ্চগতির ইন্টারনেট হবে সুলভ। থাকবে উন্নত সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা। সব ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবন গুরুত্ব পাবে; এই স্মার্ট বাংলাদেশই মূলত ২০৪১ সালের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

সাত.

স্মার্ট বাংলাদেশ নিছক কোনো গল্প বা অলীক কোনো কল্পনা নয়। আমরা সবাই মনে মনে দেশের যে ছবিটি আঁকি, দেশকে আগামী দিনে যেমন দেখতে চাই, সেই ছবিটিই ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ। এ ছবিটি এখন কিছুটা অস্পষ্ট হলেও যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে, যেমনটি হয়েছিল ডিজিটাল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নিল বন্দরে। আর সেই বাংলাদেশই হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

লেখক: প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),
এটুআই ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এজেন্সি টু ইনোভেট

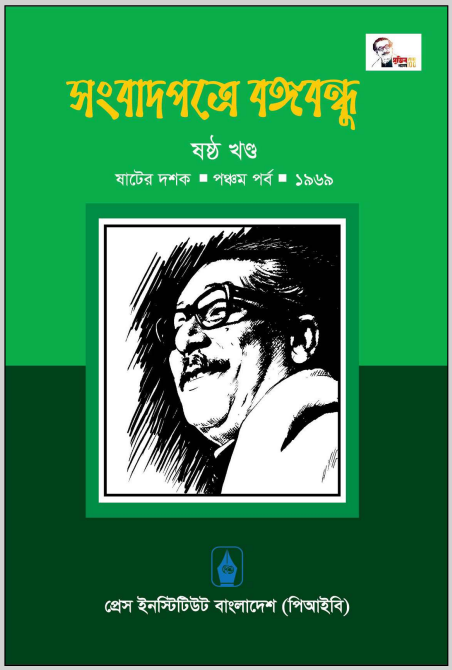

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের মহান নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প হাতে নিয়েছেন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই মহান রূপকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছেন। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' চারটি মৌলিক স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত–

- **স্মার্ট সিটিজেন:** এখানে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও দক্ষ জনগণের কথা বলা হয়, যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারাসম্পন্ন।
- **স্মার্ট সোসাইটি:** এটি একটি এমন সমাজব্যবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে সামাজিক সমস্যা সমাধানে তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নত হয়।
- **স্মার্ট ইকোনমি:** এটি জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতিব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে দক্ষতাভিত্তিক শিল্প, উৎপাদন ও সেবা খাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **স্মার্ট গভর্নমেন্ট:** এটি স্বচ্ছ, দ্রুত ও জনগণমুখী সেবাদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারী সরকারব্যবস্থাকে বোঝায়।

বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের এই মহৎ পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হলো 'স্মার্ট নাগরিক'। এককথায়–স্মার্ট নাগরিক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্পের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু কে এই স্মার্ট নাগরিক? আর কীভাবে আমরা গড়ে তুলব এই স্মার্ট বাংলাদেশ? এ প্রশ্নের জবাব খোঁজাই এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

কেবল প্রযুক্তিগত জ্ঞানী ব্যক্তিই স্মার্ট নাগরিক নন, বরং যারা প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখেন, তারাই স্মার্ট নাগরিক। তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা, সহযোগিতা এবং বিশ্বব্যাপী মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা–এসব গুণাবলি একজন স্মার্ট নাগরিকের মধ্যে বিদ্যমান। নিম্নে স্মার্ট নাগরিকের সংক্ষিপ্ত গুণাবলি দেওয়া হলো:

- **ডিজিটাল দক্ষতা:** প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট–এসবের সঠিক ব্যবহার জানা জরুরি। অনলাইনে কাজ, সেবা গ্রহণ, কিংবা নিজের ব্যাবসা পরিচালনা–সবকিছুতেই দরকার প্রযুক্তিগত দক্ষতা।
- **তথ্য সচেতনতা:** ইন্টারনেটের বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার আমাদের হাতের মুঠোয়। সঠিক তথ্য খুঁজে বের করা, গুজব এড়িয়ে চলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- **সাইবার সুরক্ষা:** ডিজিটাল দুনিয়ায় নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, অনলাইন প্রতারণা এড়িয়ে চলা–এসব বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি।
- **সমস্যা সমাধানের দক্ষতা:** জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্মার্ট নাগরিক সৃজনশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে এর সমাধানে উদ্যোগী হবেন।
- **উদ্যম ও সৃজনশীলতা:** প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু করার মানসিকতা গড়ে তোলা। ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে নিজের ব্যাবসা শুরু করা, সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা–এটিই স্মার্ট নাগরিকের চিহ্ন।
- **সামাজিক দায়িত্ব:** ডিজিটাল মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া, প্রতারণা ও অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া–এ দায়িত্বও রয়েছে আমাদের।
- **নৈতিকতা:** দেশগঠনে সৎ ও নৈতিক মানুষের গুরুত্ব অপরিসীম। স্মার্ট নাগরিক সৎ, সাহসী ও সুশাসনের পক্ষে থাকবেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবেন।

স্মার্ট নাগরিকের সঙ্গে প্রযুক্তির জ্ঞান ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রযুক্তি একটি স্মার্ট নাগরিকের সাহায্যকারী হাতিয়ার। প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিক সরকারের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগগুলো সেবা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে জনগণের জন্য আরও হাতের কাছে এনে দিয়েছে। স্মার্ট নাগরিক সোশ্যাল মিডিয়া এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে ডেটা অ্যানালিটিকস এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের জীবন তথা দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করতে সক্ষম। প্রযুক্তি সামাজিক সমতা আনয়নে, স্পষ্টতা এবং জবাবদিহি বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

> যারা প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখেন, তারাই স্মার্ট নাগরিক

স্মার্ট নাগরিক তৈরির প্রধান উপায়গুলো নিম্নরূপ

- **শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন:** স্মার্ট নাগরিক তৈরির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থাকে জ্ঞানভিত্তিক করে তোলার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি এবং জীবনমূলক দক্ষতা শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- **তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার:** স্মার্ট নাগরিক তৈরির জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার অপরিহার্য। দেশের সব স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** স্মার্ট নাগরিক তৈরির জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সমাজের সব স্তরে স্মার্ট নাগরিকের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- **প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা:** স্মার্ট নাগরিক তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি এবং জীবনমূলক দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা সম্ভব।
- **সুযোগ সৃষ্টি:** স্মার্ট নাগরিকদের দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারের বিভিন্ন প্রয়াসে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানুয়ারিতে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ঘনত্ব মোট জনসংখ্যার ৪৪.৫ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি। উবার, পাঠাও, ফুডপান্ডা-সহ অনেক সার্ভিস অ্যাপ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ যেমন: বিকাশ, নগদ, উপায়, রকেট এখন মানুষ প্রতিনিয়ত স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করছে। দেশে এখন শুরু হয়েছে এক নতুন অর্থনীতির যাত্রা, যা বিশ্বব্যাপী গিগ অর্থনীতি (Gig Economy) নামে পরিচিত। গিগ ইকোনমি হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কাজ করেন এবং মূল্যপ্রাপ্তি ও প্রদেয় সেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কর্ম সম্পন্ন করেন। এ অর্থনীতিতে, স্বাধীন কর্মীরা সাধারণত কিছু সফল প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে নিজেদের কাজপ্রাপ্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। গিগ ইকোনমির জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে উবার, পাঠাও, ফুডপান্ডা-সহ সফটওয়্যার ফ্রিল্যান্সিং। সত্যিই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণ স্মার্ট জনগণে পরিবর্তিত হওয়ায় বাংলাদেশ স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সরকারি সংস্থা সক্রিয়ভাবে অনলাইনে সেবা চালু করছে, যেমন: ডিজিটাল সিটিজেন পোর্টাল; যেখানে বিভিন্ন সরকারি সেবা অ্যাকসেস করা যায়। সরকার ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক প্রসার এবং দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগের উন্নতির জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ করছে।

উপসংহারে বলতে চাই, স্মার্ট নাগরিক হলো একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং এটি বাংলাদেশে নিয়ে আসবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একটি উন্নত ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ, যেটি আমরা সবাই চাই। বাংলাদেশে স্মার্ট নাগরিক গঠনে প্রযুক্তি, সেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও গবেষণা বিশেষ প্রয়োজন। সরকার স্মার্ট সিটিজেন তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে আরও এগিয়ে আসবে–এ প্রত্যাশায়।

লেখক: অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ

স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সিভিল সার্ভিস

মো. মঈনুল হাসান চৌধুরী

জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ দীর্ঘ সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রধান বিষয় হলেও মূল দিকনির্দেশনা ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের (১৯৭২-১৯৭৫) মধ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের Least Developed Countries (LDC)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক বিভিন্ন সূচকে ধারাবাহিকভাবে যে অগ্রগতি করেছে, এটা তারই স্বীকৃতি। এ অগ্রগতি টেকসই করতে প্রয়োজন সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হলো তথ্যপ্রযুক্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চাকে সর্বজনীন ও ব্যাপক রূপ দিতে পারলেই কেবল দেশের জন্য সামগ্রিক মঙ্গল বয়ে আনা সম্ভব হবে। আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহার 'দিনবদলের সনদ'-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার

প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। রূপকল্প ২০২১-এর মূল উপজীব্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১। এ পরিকল্পনা ভিত্তি স্থাপন করেছে স্মার্ট বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার। স্মার্ট বাংলাদেশ এর ৪টি স্তম্ভের একটি হলো স্মার্ট গভর্নমেন্ট।

স্মার্ট গভর্নমেন্টের বেশকিছু উপাদান রয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদানের ওপর আলোকপাত করা হলো:

১. **গভর্ন্যান্স:** স্মার্ট গভর্নমেন্টের উপাদান হিসাবে গভর্ন্যান্স বলতে বোঝানো হয়েছে, এমন একটি আন্তবিভাগীয় পদ্ধতি বা কাঠামো, যা উদ্ভাবনী অগ্রাধিকারগুলোকে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। সেক্ষেত্রে এ সিস্টেমে গভর্নমেন্টের প্রতিটি বিভাগ থেকে প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক, কারণ অনেক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিভাগের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

২. **উপাত্ত ও ফলাফল:** ফলাফল বা সিদ্ধান্ত তৈরিতে ডেটা বা উপাত্ত খুবই শক্তিশালী, যা সরকার যুগপৎ প্রচুর তৈরি ও ব্যবহার করে। যদিও কখনো কখনো ওইসব উপাত্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা তথ্যের গোপনীয়তার বেড়াজালে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে উপাত্ত তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, Internet of Things (IoT) ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বের করা যেতে পারে, যা সঠিক ফলাফল পেতে সহায়ক হবে।

৩. **অংশীদারত্ব:** স্মার্ট গভর্নমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো অংশীদারত্ব। আমরা সেই সরকারকে স্মার্ট বলতে পারি, যে বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জ একা মোকাবিলা না করে এমন অংশীদার খুঁজে বের করবে, যারা সমস্যা সমাধানের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো তৈরিতে বিনিয়োগ ও ঝুঁকি শেয়ার করবে। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অংশীদার কিন্তু বিক্রেতা নন। যে সমস্যার সমাধান ইতোমধ্যে বাজারে রয়েছে, তা সরকার বিক্রেতার (vendor) কাছ থেকে কিনতে পারে। কিন্তু যে প্রয়োজনীয়তা অজানা, সমাধান সবার কাছে অস্পষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে সমন্বিত অংশীদারত্ব চমৎকার কাজ করে।

৪. **তহবিলের জোগান এবং টেকসই ক্রয়ব্যবস্থা:** অপরিহার্য পরিষেবার ব্যয় মিটিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো তহবিল জোগান দেওয়া বেশ চ্যালেঞ্জের কাজ। বাজেটের ঘাটতি সরকারি সংস্থাগুলোর উদ্ভাবনী কাজে সক্ষমতা ও উৎসাহ কমিয়ে দেয়। তাই এসব কাজে তহবিলের জোগান নিশ্চিত করা গেলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। একই সঙ্গে টেকসই ক্রয়ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে, যা চাহিদা, কারিগরি বিনির্দেশ ও মানদণ্ডগুলোকে একীভূত; সম্পদের কার্যকারিতা, পণ্যের মান ও সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয় সমন্বয় করার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমর্থন করবে।

৫. **সক্ষমতা:** সরকারকে স্মার্ট হতে হলে উদ্ভাবনী চিন্তায় সক্ষম জনবল গড়ে তুলতে হবে। সরকারের প্রত্যেকেরই মূল কাজের দায়িত্ব রয়েছে, যা তাদের নতুন ধারণা অন্বেষণ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে। ফলে অত্যাবশ্যকীয় সরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নতুন নতুন সমাধান খুঁজে বের করে কাজে লাগানো এবং মূল্যায়নের জন্য নিবেদিত সক্ষম জনবলের অংশীদারত্ব থাকা দরকার।

৬. **মূল্যবোধ:** নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে উদ্ভাবনী উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চর্চা মূল্যবোধ হিসাবে গড়ে তোলা স্মার্ট গভর্নমেন্টের অন্যতম কাজ। মূল্যবোধের মধ্যে সাম্যতা, টেকসই, গোপনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা দেশের প্রতিটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করা হয়। এ মূল্যবোধগুলো বিনিয়োগ, নীতি ও অংশীদারত্বের মূল্যায়ন, অগ্রাধিকার ও যোগাযোগের মধ্যে নিহিত আছে এবং দেশের উদ্ভাবনী উদ্যোগের মধ্যে অগ্রাধিকারগুলোকে অংশীদারদের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে।

৭. **কর্মসংস্কৃতি:** স্মার্ট সরকার এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা তাদের কর্মীদের মধ্যে উদ্ভাবন, ক্রমাগত উন্নতি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দেয়। প্রায়ই পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের দায়িত্ব একটি অবস্থান বা অফিসের মধ্যে থাকে, তবে সেরা ধারণা এবং দক্ষতা এমন কর্মীদের সঙ্গে থাকতে পারে, যারা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নন। সরকারের উন্নতির জন্য আমাদের এমন লোকদের জড়িত করতে হবে।

৮. **সম্প্রদায়ের সংযুক্তি:** কোনো প্রকল্পের আগে, চলাকালীন ও পরে অংশগ্রহণকারী/সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলোকে জড়িত করার জন্য স্মার্ট গভর্নমেন্টের একটি প্রক্রিয়া প্রয়োজন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক প্রযুক্তি উদ্যোগের সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য অপরিহার্য এবং প্রায়ই তারা প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়, যা সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল সমাধানগুলোর প্রতি অবিশ্বাসের জন্ম দিতে পারে। অনেক স্মার্ট গভর্নমেন্টের প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ভালো; কিন্তু সংশয়, ভয় বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে তা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। শুধু যোগাযোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংশয় বা ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা যেতে পারে।

স্মার্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার ধাপগুলো হলো

১. **কৌশলী গভর্নমেন্ট:** কৌশল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঠিক পন্থা ছাড়া সংস্কারের অন্য উপাদানগুলো কাজ করবে না। সরকার যে ভালো কিছু করার চেষ্টা করছে, তা সমালোচকদের বোঝানোর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো কৌশলপত্র তৈরি করা। এটি সংস্কারের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কৌশলগত উদ্দেশ্য বোঝার জন্য জনশক্তি ব্যবস্থাপনা ও তাদের সেবা প্রদানবিষয়ক কার্যক্রমের উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরি। কৌশল বাস্তবায়নে যেহেতু কুশলী হতে হয়, তাই এটি উদ্ভাবনী শক্তিকে চালিত করে। উদ্ভাবনী ডিজিটাল রূপান্তর কোথায় করতে হবে এবং কোথায় নতুন উদ্ভাবন করতে হবে, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কৌশলগত উদ্দেশ্য বুঝতে হবে।

সরকারের বড়ো ও জটিল প্রকল্পগুলো সক্রিয় ব্যবস্থাপনার অভাবে বাস্তবায়ন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। কৌশলী গভর্নমেন্ট বড়ো বড়ো প্রকল্পের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

২. **সক্ষম গভর্নমেন্ট:** সক্ষম গভর্নমেন্ট গড়ে তুলতে চারটি বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত আর সেগুলো হলো:
   (ক) অগ্রাধিকার নির্ণয় ও নেতৃত্ব ঠিক করা
   (খ) সরকারের বিভাগগুলো কীভাবে পরিচালিত হয় তাতে স্বচ্ছতা আনা
   (গ) মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর কাজের ক্ষমতা ও কাজের পদ্ধতিতে সক্ষমতা বাড়ানো এবং
   (ঘ) মেধাবী সিভিল সার্ভিস গঠন।

৩. **উদ্ভাবনী গভর্নমেন্ট:** করোনা মহামারি আমাদের প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। উদ্ভাবন যে কোনো পন্থায়ই হতে

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ৪টি মূল স্তম্ভ: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতিকে আইসিটি সমন্বয়ের মাধ্যমে সেতুবন্ধ গড়ে তুলবে ... আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ দেশ ও সমাজের উন্নতি নিশ্চিত করবে, গড়ে তুলবে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

পারে। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উদ্ভাবন সহজতর হয়। তাই আমাদের সরকারও সেবা ডিজিটাইজেশনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। ডিজিটাইজডকৃত সেবাগুলো আরও উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে স্মার্ট অ্যাপ্লিকেশনে নিয়ে আসতে হবে।

৪. **দায়বদ্ধ গভর্নমেন্ট:** প্রথমে ডিজিটাল বাংলাদেশ, এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই সরকারব্যবস্থা বিনির্মাণে দায়বদ্ধতা একটি মূল্যায়ন সূচক হতে পারে। দায়বদ্ধ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা তাই স্মার্ট গভর্নমেন্ট অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

আইসিটি মাস্টার প্ল্যান ২০৪১-এর আলোকে স্মার্ট গভর্নমেন্ট

স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনে আইসিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ২০২১-৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় উচ্চাভিলাষী আর্থসামাজিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল' থেকে 'স্মার্ট-এ যাত্রা করতে হবে। অটোমেশন এবং ডিজিটাইজেশনের পরিবর্তে মূলত ডেটাকেন্দ্রিক ডিজাইন এবং মানবকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ওপর মনোযোগী হতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ৪টি মূল স্তম্ভ: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতিকে আইসিটি সমন্বয়ের মাধ্যমে সেতুবন্ধ গড়ে তুলবে।

২০৪১ সালের স্মার্ট সরকার স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, জননিরাপত্তা প্রভৃতির মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রজুড়ে শতভাগ কাগজবিহীন অফিস এবং হাইপার পার্সোনালাইজড সার্ভিস প্ল্যাটফরম বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'অদৃশ্য শাসন' ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে।

আইসিটি মাস্টার প্ল্যান ২০৪১-এ স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নে নিম্নে উল্লেখিত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা করা হয়েছে:

চেঞ্জ পিলার ২০২৫ ২০৩১ ২০৪১

স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নে কিছু পরিকল্পনা

- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু মন্ত্রণালয় / বিভাগকে কাগজবিহীন অফিস করা
- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিক সেবা স্মার্টকরণ নিশ্চিত করা
- ৫০০-এর অধিক সরকারি পরিষেবা প্রযুক্তির মাধ্যমে চালু করা
- নাগরিক সেবা স্মার্টকরণের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হবে
- সরকারের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রতিস্থাপন করা হবে
- ৮০ শতাংশের অধিক পরিষেবা প্রযুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে
- ৮০ শতাংশের অধিক নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে
- সম্পূর্ণরূপে কাগজবিহীন প্রশাসন
- অদৃশ্য সরকার সেবা অতিব্যক্তিকরণ প্ল্যাটফরমে নিশ্চিতকরণ
- ৯৫ শতাংশের অধিক নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জন

স্মার্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা

প্রত্যেক নাগরিকের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি সেবাগুলোকে বিগ ডেটানির্ভর মেশিন লার্নিং এবং এআই-নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে সরকারি সেবাগুলো প্রদান প্রত্যেক নাগরিকের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হবে। এ উন্নত প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহারের জন্য সেবা প্রদানকারীকে উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন হতে হবে। তাই গভপ্রেনিউর (একজন সরকারি উদ্যোক্তা)-এর পাশাপাশি সিভিল সার্ভিস ২০৪১-এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে ডিজিটাল নেতৃত্বগুণ বৃদ্ধি করা। এর মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস নিজেকে আগামী দিনের প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবে এবং জনগণের চাহিদা পূরণে আজকের চেয়ে আরও দক্ষ হতে পারবে।

২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম ভিত্তি হবে গভপ্রেনিউর এবং ডিজিটাল নেতৃত্বগুণসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস। তারা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবেন এবং উন্নতমানের জীবনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করবেন। তারা দক্ষ এবং কার্যকরভাবে সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তারা একটি নাগরিকবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ উদ্ভাবনে অবদান রাখবেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হয়ে তৈরি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০২২ ঘোষণা করেন সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ়প্রত্যয়। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ দেশ ও সমাজের উন্নতি নিশ্চিত করবে, গড়ে তুলবে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, যা হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিগত ও উদ্ভাবনী।

তথ্যসূত্র

১. নির্বাচনি ইশতাহার ২০২৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২. বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
৩. স্মার্ট বাংলাদেশ-আইসিটি মাস্টার প্ল্যান ২০৪১, আইসিটি ডিভিশন
৪. Elements of Smart Government, Colorado Smart Cities Alliance
৫. Smarter Government, Alex Thomas, Institute for Government, UK
৬. উদ্ভাবনী ও স্মার্ট সিভিল সার্ভিস, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, উপসচিব, প্রজেক্ট অ্যানালিস্ট (একসেবা ইমপ্লিমেন্টেশন), এটুআই

লেখক: উপপরিচালক (প্রশাসন), এনএপিডি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রবন্ধ

স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১

প্রফেসর ড. ফরহাদ রাব্বি

'স্মার্ট বাংলাদেশ' শব্দযুগল শোনেননি–এমন মানুষ এ সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সভা-সমিতি বলি, প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলি, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি-বেসরকারি দপ্তর বলি–সব জায়গায়ই স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে একটা আলোচনা আছে। রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১। একসময় এ ধরনের রূপকল্প রূপকথা মনে হলেও এখন কমবেশি সবাইকে স্বীকার করতে হবে আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সহজলভ্যতা আর এর ব্যবহারে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। কী ব্যক্তিজীবন, কী সমাজ-জীবন–সবখানেই লেগেছে প্রযুক্তির স্পর্শ। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত হয়ে ওঠা ডিজিটাল বাংলাদেশের গল্প অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিজিটাল পণ্য বা সেবার গল্প। স্মার্ট বাংলাদেশ এসেছে ক্ষুদ্র গল্পগুলোকে বৃহৎ গল্পে পরিণত করতে আর অনেক অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করতে। প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য বা সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া ও কাস্টমাইজেশন সেবা। সর্বত্র আমাদের চেষ্টা ছিল সনাতন বা গতানুগতিক যে কাজগুলো আমরা করি, তা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজ করা, সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন সচেতনতা আর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আর স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ হলো সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ প্রচারণারই বর্ধিত ভাবনা। ডিজিটাল বাংলাদেশে যেমন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে, সনাতন পদ্ধতির সব কাজে, তেমনই স্মার্ট বাংলাদেশের মূল ধারণা হলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগুলোকে শুধু ব্যবহার করা

নয়, উদ্ভাবনীমূলকভাবে ব্যবহার করা। স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণার চারটি ভিত্তি–স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটি হচ্ছে স্মার্ট অর্থনীতি। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি–এসবই স্মার্ট অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। স্মার্ট বাংলাদেশ আসলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি গঠনেরই রূপকল্প।

স্মার্ট অর্থনীতি সহজ ভাষায় বললে বোঝায় গতানুগতিক অর্থনীতির কর্মকাণ্ডকে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালনা করা। অবশ্যই এর মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার যেমন থাকতে হবে, তেমনই নিশ্চিত হতে হবে জনগণের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণও। স্মার্ট অর্থনীতি ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, শিক্ষা অথবা ভৌগোলিক দূরত্ব–নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি, শিল্প, সব সেবা খাতে; ক্ষুদ্র, কুটির, মাঝারি-সহ সব ব্যাবসার ক্ষেত্র সহজ করাই হলো স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট অর্থনীতির লক্ষ্য। এমন এক অর্থনীতি হবে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি সহযোগে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাবে দ্রুত ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত; সহজে করা যাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা; ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠবে দক্ষ। স্মার্ট অর্থনীতির জন্য উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা ও স্মার্ট বাণিজ্যের প্রক্রিয়াগুলো চর্চা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই দরকার উপযুক্ত অবকাঠামো ও জনশক্তি তৈরি করা।

আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আছি। এ যুগের প্রযুক্তিগুলো আমাদের জীবনযাত্রা ও কাজের পদ্ধতিকে পরিবর্তন করছে। অন্যান্য শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লব শুধু মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে যন্ত্র ও প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে দ্রুততর করেছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমকে আরও গতিশীল ও নিখুঁত করে তুলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে ব্যাবসার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা যেতে পারে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন নতুন সেবা চালু হতে পারে। এটা খুবই জরুরি যে সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যাবসায়িক উদ্যোগগুলো পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে এবং অর্থিনীতিতে নতুন নতুন ভ্যালু যোগ করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গাপুরের স্মার্ট নেশন উদ্যোগে যেসব ব্যাবসা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে, তারা কর প্রণোদনা ও আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে; এর ফলে যেটা হয়েছে তা হলো–উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা ও উন্নত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণকে ত্বরান্বিত করার একটা ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠা।

বাংলাদেশের একজন সাবেক গভর্নর চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন–স্মার্ট অর্থনীতি গড়তে চাই স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নীতিনির্ধারক, স্মার্ট রেগুলেশন, স্মার্ট উদ্যোক্তা তথা জনশক্তি এবং স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থা। পুরো সমাজ সেকেলে থাকলে এ রূপান্তর প্রায় অসম্ভব। সমাজকেও আধুনিক, আশাবাদী ও স্মার্ট হতে হবে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ যাতে প্রতিযোগিতামূলক থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য, ভবিষ্যতের চাকরির জন্য কর্মীবাহিনীকে প্রস্তুত করে এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করা অপরিহার্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে কেবল প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং সৃজনশীলতা, গভীর চিন্তাশক্তি, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, সহমর্মিতার মতো সফট স্কিলগুলোও থাকা জরুরি।

স্মার্ট অর্থনীতি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) এবং জাইকার সহযোগিতায় আইসিটি বিভাগ প্রণীত 'স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি ২০৪১ মাস্টারপ্ল্যান'-এ। এ মহাপরিকল্পনায় ২০৪১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান ২০ শতাংশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন: এআই, আইওটির সঙ্গে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং শক্তিশালী প্রযুক্তি অবকাঠামো দ্বারা একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি তৈরি করা হবে। এ অগ্রসর প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প উৎপাদনে শূন্য কার্বন বর্জ্য হবে। আর শিল্পে ব্যবহৃত উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্যগুলো যতটা সম্ভব পুনর্ব্যবহার করা হবে।

অনেকের মাঝে সন্দেহ বা বিভ্রান্তি কাজ করতে পারে এই ভেবে যে, স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত এবং জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান ২০ শতাংশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী কি না! যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তৈরি করা কোম্পানির মাধ্যমেই সিলিকনভ্যালি প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআইটির শিক্ষার্থীরা ৩০ হাজার ২০০ কোম্পানি তৈরি করে, যেখানে ৪ দশমিক ৬ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং কোম্পানিগুলোর সম্মিলিত আয় বছরে ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার। এটা সম্ভব হয় এমআইটি তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য স্টার্টআপ, বিজনেস ইনকিউবেশন, উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার ফলে।

নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স (এনআরআই) সম্প্রতি এক রিপোর্টে প্রকাশ করে, যেখানে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের প্রভাবসহ বিভিন্ন দিক নির্ণয় করা হয়েছে মূলত প্রযুক্তি, মানবসম্পদ, শাসন ও প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে। এই প্রকাশনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তুলতে অনেক জায়গায় কাজ করার সুযোগ আছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। হাই-টেক, মিডিয়াম হাই-টেক প্রযুক্তি উৎপাদন ও রপ্তানি এবং আইসিটি সেবা রপ্তানি শিল্পতে ভালো উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশন শিল্পের বদৌলতে স্মার্ট বাণিজ্যে বেশকিছু ভালো কাজ হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোবাইল পেমেন্ট সিস্টেম। আমরা এখন ছোটো-বড়ো সব ধরনের পণ্য বা সেবা কেনাকাটায় মোবাইল পেমেন্ট ব্যবহার করতে পারছি। তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশন খাত একত্রে তাদের দক্ষতা ও পারস্পরিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে নতুন নতুন অনেক পরিষেবা চালু করতে পারে। এর মাধ্যমে স্মার্ট, আরও দক্ষ এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ইকোসিস্টেম আমরা পেতে পারি। আর এ ধরনের ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যখন উদ্ভাবন যুক্ত হবে, তখনই বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাবে। টেলকো পরিষেবা প্রদানকারীরা খুব সহজে স্টার্টআপগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, সংযোগ এবং বিকাশের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফরম প্রদান করতে পারে। এ পরিষেবা প্রদানকারীরা ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম, ফান্ডিং এবং মেন্টরশিপের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলোকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার মাধ্যমে, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশে এখনো অনেক শিক্ষিত নারীকে সংসারের দায়িত্ব নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। তাদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং দারুণ সুযোগ। ঘরে বসেই কাজের সুযোগ থাকায় বাংলাদেশের নারীরা এখন তাদের প্রথাগত সাংসারিক দায়িত্বের গণ্ডি পেরিয়ে ফ্রিল্যান্স কাজকে ক্যারিয়ার সংকটের সমাধান হিসাবে দেখছে। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের নারীরা ফ্রিল্যান্সার হিসাবে এখন

পুরুষের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আর নারীর অংশগ্রহণে এ সেক্টর আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের বেশির ভাগ ফ্রিল্যান্সার সিপিএ (Cost Per Action) মার্কেটিং নিয়ে কাজ করছে, অন্যদিকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির বেশির ভাগ দখল করে আছে প্রতিবেশী দেশ। প্রতিযোগিতার বাজারে নেতৃত্ব দিতে হলে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে, কম্পিউটার ও মোবাইল গেম ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের আরও দক্ষ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল পেতে সব ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে সামনে আনতে সরকার দেশে অনেক হাই-টেক পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। হাই-টেক পার্কের কাজ হবে তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটিসংক্রান্ত সব ধরনের কাজ সম্পাদন, আইটিকে ব্যাবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা, আইটি সেক্টরে সব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তিসংক্রান্ত সব আমদানি-রপ্তানির সুবিধা নিশ্চিত করা। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, স্টার্টআপ বাংলাদেশ, আইডিয়া প্রজেক্ট-সহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে ইনোভেশনকে কেন্দ্র করে। সরকার এরই মধ্যে নিজের সেবাগুলোকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে, সেবাপ্রাপ্তিতে নগর ও গ্রামের ব্যবধান কমিয়ে আনতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি সেবা mygov.bd, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং, জনতার সরকার, প্রত্যয়ন, বাংলাদেশ ই-ডিরেক্টরি, উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর, আমার আদালত, মুক্তপাঠসহ অসংখ্য ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে দেশকে বিশ্বদরবারে তালমিলিয়ে চলার উপযোগী করে তুলছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে ই-কমার্স, ইআরপি সলিউশন, এআর/ভিআর এবং ব্যাবসায়িক সব কার্যক্রম অটোমেশন করার ক্ষেত্রে অসংখ্য টেক প্রতিষ্ঠান সহযোগী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২৩ সালের শুরুর দিকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং খাতে নিয়মিত কাজ করছেন সাড়ে পাঁচ লাখ ফ্রিল্যান্সার। আর মোট নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী, প্রতিবছর ফ্রিল্যান্সাররা ৫০ কোটি ডলার আয় করে থাকেন, যা আমাদের ৫০ বিলিয়নে উন্নীত করতে হবে। দেশীয় অর্থনীতিতে প্রযুক্তি শিল্পের এ অবদান আরও বেগবান করতে হলে সরকারি ও বেসরকারিভাবে সুদৃঢ় পরিকল্পনার প্রয়োজন। না হলে সময়ের পাল্লায় আমরা প্রতিযোগিতার বাজার থেকে পিছিয়ে পড়ব। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ আর এর স্মার্ট অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোর একটি শক্তিশালী ভিত্তি। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যেখানে আমাদের জোর দিতে হবে এবং কাজ করতে হবে। এর প্রথমেই আসে একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মার্ট অর্থিনীতিবান্ধব নীতিমালা। নীতিগুলো হওয়া উচিত প্রগতিশীল, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে। দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের প্রয়োজন বিবেচনা করে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমর্থন করে–এমন নীতিগুলোকে সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। উন্নত নেটওয়ার্ক অবকাঠামো যেমন 5G এবং ফাইবার অপটিক্সের মতো প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ও উচ্চগতির সংযোগ প্রদানের সক্ষমতা তৈরি হবে। এটি শুধু নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে না বরং একটি পরিবেশ তৈরি করবে, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। এর সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে শক্তিশালী সাইবার সিকিউরিটি নীতি। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের প্রচার, একটি দক্ষ সাইবার নিরাপত্তা কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও সংবেদনশীল তথ্য রক্ষার জন্য অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সমাধান বাস্তবায়ন করা। সর্বোপরি সরকার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, একাডেমিয়া এবং অন্য স্টেকহোল্ডাররা একত্রে কাজ করার মাঝেই নিহিত আছে স্মার্ট অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডাররা শুধু সম্পদ সংগ্রহ বা জ্ঞান বিতরণ করা নয়, সাধারণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এবং সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্ভাবনী সমাধানের প্রয়োগ করতে পারে।

লেখক: অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প পর্যালোচনা টেকসই অগ্রগতির জন্য স্মার্ট সোসাইটি

কাজী মোহাম্মদ সালাতুজ্জামান

২০২১ সাল অবধি ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন শেষে মূলত ২০২২ সাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের সড়কে পদার্পণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির ওপর নির্মিত এই উচ্চাভিলাষী রূপকল্প হচ্ছে একটি স্মার্ট এবং অধিক টেকসই সমাজ তৈরির জন্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে ব্যাপকভিত্তিক কাজে লাগানো। এ প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলার ধারণা, যেটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নকে চালিত করার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের জীবনমানকে আরও উন্নত করবে। একটি স্মার্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য শুধু প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা নয়, বরং জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, নাগরিকের ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখাও এটির অন্যতম লক্ষ্য।

সাংবাদিক সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন সব উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করেন, যা একটি স্মার্ট সোসাইটির দিকে অগ্রসরের পথে চালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা

স্মার্ট বাংলাদেশ নিছক একটি প্রযুক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নয় বরং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি; যা সমাজ, অর্থনীতি এবং শাসনের বিভিন্ন মাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি আবর্তিত হবে চারটি মূল স্তম্ভকে ঘিরে:

১. স্মার্ট নাগরিক,
২. স্মার্ট সরকার,
৩. স্মার্ট অর্থনীতি এবং
৪. স্মার্ট সোসাইটি।

প্রতিটি স্তম্ভ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি ডিজিটালি সক্ষম (digitally enabled) এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত জাতি গঠনের অভিপ্রায়ে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১-কে যেসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হবে, সেগুলো হচ্ছে:

ক. **সমৃদ্ধ অর্থনীতি:** যার লক্ষ্য মাথাপিছু জিডিপি ন্যূনতম ১২ হাজার ৫০০ ডলার।

খ. **দারিদ্র্য দূরীকরণ:** চরম দারিদ্র্য শূন্য শতাংশে আনার জন্য চেষ্টা করা এবং সামগ্রিক দারিদ্র্য তিন শতাংশের নিচে রাখা।

গ. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি (৪-৫%), ন্যূনতম ঘাটতি (জিডিপির ৫%), বিনিয়োগ বৃদ্ধি (জিডিপির ৪০%) এবং বর্ধিত কর রাজস্ব (জিডিপির ২০%)-সহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

ঘ. **মানব উন্নয়ন:** আমাদের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের (demographic dividend) সর্বোত্তম ব্যবহার করার মাধ্যমে ডিজিটাল সাক্ষরতা-সহ সর্বজনীন মাধ্যমিক (higher secondary) শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং সব নাগরিকের জন্য শতভাগ স্বাস্থ্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

ঙ. **টেকসই নগরায়ণ:** শতভাগ বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি ৮০ ভাগ নগরায়ণ এবং বিদ্যুতায়নের প্রধানতম উৎস হবে নবায়নযোগ্য শক্তি (renewable energy)।

চ. **ডিজিটাইজড পাবলিক সার্ভিস:** সব পাবলিক সার্ভিসকে কাগজবিহীন (paperless) এবং নগদ মুদ্রাবিহীন (cashless) ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক তাদের পছন্দ অনুযায়ী সহজে সেবা নিতে পারেন।

সর্বোপরি, স্মার্ট বাংলাদেশের সারমর্ম ন্যায্যতা বৃদ্ধিকরণের (maximize) মধ্যেই নিহিত। স্মার্ট বাংলাদেশ মানেই হবে একটি ন্যায়সংগত রাষ্ট্র, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান অধিকার ও সুযোগ (equal right and opportunity) উপভোগ করবে এবং যেখানে কোনো প্রান্তিক গোষ্ঠী (marginalized group) বলে কিছু থাকবে না। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি মূলস্তম্ভ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. স্মার্ট নাগরিক

স্মার্ট বাংলাদেশের মূলে রয়েছে এর নাগরিক। প্রযুক্তির দ্বারা ক্ষমতায়িত ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনকে উন্নত করার পাশাপাশি দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারবেন। স্মার্ট নাগরিক সক্রিয়ভাবে ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং প্ল্যাটফরম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের প্রবেশাধিকার ও প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। অনলাইনে সরকারি পরিষেবাগুলো সর্বোচ্চ ব্যবহার করা থেকে শুরু করে ডিজিটাল চ্যানেলের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থের পক্ষে মতপ্রকাশের ভেতর দিয়ে স্মার্ট নাগরিক বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

২. স্মার্ট সরকার

ডিজিটাল যুগে দক্ষ জনপ্রশাসন এবং সেবা প্রদানের জন্য একটি স্মার্ট সরকার অপরিহার্য। এটি সেবা প্রদান প্রক্রিয়াগুলোকে সুবিন্যস্ত করতে, স্বচ্ছতা বাড়াতে এবং নাগরিককে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ই-গভর্ন্যান্স, ডিজিটাল আইডেনটিটি সিস্টেম এবং ওপেন ডেটা প্ল্যাটফরমের মতো উদ্যোগ একটি স্মার্ট গভর্নমেন্ট অবকাঠামো তৈরির জন্য অবিচ্ছেদ্য, যা নাগরিককেন্দ্রিকতা (citizen-centricity) এবং প্রতিক্রিয়াশীলতাকে (feedback mechanism) অগ্রাধিকার দেয়।

৩. স্মার্ট অর্থনীতি

স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বকে বজায় রাখা। ডিজিটাল উদ্যোক্তাদের অগ্রসর করা থেকে শুরু করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (4IR) মূল প্রযুক্তিগুলো যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI), বিগ ডেটা এবং অ্যানালিটিকস (Big Data and Analytics), ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing), ব্লকচেইন প্রযুক্তি (Blockchain Technology), বায়োটেকনোলজি (Biotechnology), ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology), রোবোটিকস (Robotics), সিমুলেশন/ডিজিটাল টুইন (Simulation/ Digital Twin), অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং যেমন: ৩-ডি প্রিন্টিং (Additive Manufacturing such as 3-D printing), অগমেন্টেড রিয়েলিটি (Augmented reality), সাইবার নিরাপত্তা (Cyber security) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস বা the Industrial Internet of Things (IIoT)-এর মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলোকে প্রথাগত (traditional) শিল্পে অঙ্গীভূত করার মাধ্যমে স্মার্ট অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য একটি গতিশীল এবং স্থিতিস্থাপক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা (ecosystem) তৈরি করা। উদ্ভাবনী সক্ষমতা অর্জন, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রতিভা চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ ডিজিটাল উদ্ভাবন ও বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

৪. স্মার্ট সোসাইটি

একটি স্মার্ট সোসাইটি তৈরি করা অর্থ শুধু প্রযুক্তি গ্রহণ করাই নয় বরং এটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং নাগরিক সম্পৃক্ততাকে নিশ্চিত করে। স্মার্ট সোসাইটির উদ্যোগগুলো ডিজিটাল বিভাজনের সেতুবন্ধ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতার উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে মনোযোগ দেবে। উপরন্তু সবুজ অবকাঠামো (Green Infrastructure), নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy) গ্রহণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (Waste Management) মতো টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সব নাগরিকের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলো

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্পটি অপরিসীম প্রতিশ্রুতি ধারণ করলেও এতে অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যা মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হবে। বিগত বছরগুলোয় অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হলেও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নতুন চাহিদার উদ্ভবের ফলে এখনো অনেক অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা থেকে শুরু করে সাইবার নিরাপত্তার হুমকি এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা-সহ বিভিন্ন বাধা এখনো বর্তমান রূপকল্পটি বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান।

> একটি স্মার্ট সোসাইটি তৈরি করা অর্থ শুধু প্রযুক্তি গ্রহণ করাই নয় বরং এটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং নাগরিক সম্পৃক্ততাকে নিশ্চিত করে ... টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সব নাগরিকের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

অবশ্য সক্রিয় পদক্ষেপ, উদ্ভাবনী সমাধান, সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং সুশীলসমাজের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করা যেতে পারে।

দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এবং গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন

সাংবাদিক জনসাধারণকে অবহিত করতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট সোসাইটির উদ্যোগকে ঘিরে আখ্যান (narrative) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ (insightful analysis), নীতি ও কর্মসূচির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন (critical evaluation of policies and programs) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সাংবাদিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে, সংলাপকে উৎসাহিত করতে এবং অংশীজনদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারেন। সাফল্যের গল্প এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো তুলে ধরা থেকে শুরু করে চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতা অনুসন্ধান করার জন্য গবেষণাধর্মী সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাংবাদিক অগ্রগতি এবং পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারেন।

আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করতে অবদান রাখা

একটি স্মার্ট সোসাইটি এমন একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করে, যেখানে প্রযুক্তি একটি বড়ো সমতাবিধায়কের ভূমিকায় কাজ করে, আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করে।

সাংবাদিক ওইসব উদ্যোগের দিকে নজর দিতে পারেন, যেগুলো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবা গ্রহণের সক্ষমতা (Digital Accessibility) প্রদানের এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে; যার ফলে তারা ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের উদ্যোগ থেকে উপকৃত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সাফল্যের গল্প তুলে ধরে সাংবাদিক অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণে ভূমিকা রাখা

একটি স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বাংলাদেশে বিদ্যমান ডিজিটাল বিভাজন দূর করা। শহুরে জনগোষ্ঠী ডিজিটালভাবে সংযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠলেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার সীমিত সুবিধার (limited digital access) কারণে পিছিয়ে থাকে। যদিও ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০২১-এর অন্যতম উদ্ভাবন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ডিজিটাল একসেস ও সংযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে, তথাপি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ এখনো ডিজিটাল সাক্ষরতার বাইরে রয়েছে।

সাংবাদিক সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল বিভাজন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করার মতো উদ্যোগগুলোকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে পারেন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখা

একটি স্মার্ট সোসাইটিতে সবার অন্তর্ভুক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিক ওইসব প্রচেষ্টাকে তুলে ধরতে পারেন, যেগুলো ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে নারী, সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলোয় সুযোগ প্রদান থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা এবং অর্থনৈতিক সুযোগকে উৎসাহিত করে সাংবাদিক প্রান্তিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনে প্রযুক্তির রূপান্তরমূলক প্রভাব তুলে ধরতে পারেন।

ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রচার

ডিজিটাল সাক্ষরতা একটি স্মার্ট সোসাইটির কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে থাকে, যা নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার সঙ্গে সুবিশাল ডিজিটাল ক্ষেত্রে বিচরণে সক্ষম করে।

সাংবাদিক ডিজিটাল সাক্ষরতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং ব্যাপক ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। নাগরিককে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত করার সফল উদ্যোগগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচিগুলোতে সংযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং গুণগত শিক্ষার প্রচার

একটি স্মার্ট সোসাইটিতে প্রযুক্তি ভৌগোলিক অবস্থান বা আর্থসামাজিক অবস্থা, নির্বিশেষে সব নাগরিকের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং গুণগত শিক্ষার একটি দুয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।

সাংবাদিক উদ্ভাবনী টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফরম, ই-লার্নিং উদ্যোগ এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রোগ্রামগুলোকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে

আসতে পারেন, যা অপরিহার্য পরিষেবাগুলো সরবরাহে বিপ্লব ঘটাতে পারে। উজ্জীবনী বক্তব্য এবং বাস্তব জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে সাংবাদিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সামগ্রিক কল্যাণে প্রযুক্তির রূপান্তরমূলক প্রভাব সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়াতে পারেন।

নারী ও যুবাদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখা

একটি স্মার্ট সোসাইটিতে লিঙ্গসমতা ও যুব ক্ষমতায়ন হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) এবং উদ্ভাবনী ভাবনার জন্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সাংবাদিক এমন উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করতে পারেন, যা ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রোগ্রাম, উদ্যোক্তা সুযোগ সৃষ্টি এবং পরামর্শমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও যুবকদের ক্ষমতায়ন করে। নারী এবং তরুণ নেতারা যারা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করছে, তাদের গল্প ছড়িয়ে দিয়ে সাংবাদিক অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং লিঙ্গসমতা, যুব ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে থাকে এমন নীতিগুলোর পক্ষ সমর্থন করে প্রচার চালাতে পারেন।

পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখা

দীর্ঘস্থায়িত্ব (sustainability) একটি স্মার্ট সোসাইটির মূল ভিত্তি, যেখানে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলো ব্যবহার করা হয় পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো প্রশমিত করতে এবং পরিবেশবান্ধব চর্চাগুলোকে উন্নীত করার জন্য।

সাংবাদিক নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার (renewable energy adoption), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমাধান (waste management solutions) এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপক কৌশলগুলোর (climate resilience strategies) ওপর গুরুত্ব প্রদান করে উদ্যোগগুলোর ওপর গবেষণাধর্মী ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তৃণমূলের প্রচেষ্টা সামনে আনার মাধ্যমে সাংবাদিক টেকসই উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুরক্ষিত করার জন্য নীতি গ্রহণ ও সংস্কারের পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন জোগাড় করতে পারেন।

নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা

একটি স্মার্ট সোসাইটি নাগরিকের সক্রিয় সম্পৃক্ততা এবং শাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

সাংবাদিক নাগরিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সংলাপ সহজতর করার সুযোগ তৈরি করতে পারেন, নাগরিকের দাবি/বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন এবং সরকারি উদ্যোগগুলোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারেন। নাগরিক উদ্যোগ, তৃণমূল আন্দোলন এবং অংশগ্রহণমূলক সুশাসনের ধারণার ওপর সংবাদ তৈরির মাধ্যমে সাংবাদিক বৃহত্তর নাগরিক সম্পৃক্ততাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ার মাধ্যমে নব নব সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

ডেটার গোপনীয়তা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা

যেহেতু বাংলাদেশ ডিজিটাইজেশনকে আলিঙ্গন করেছে, নাগরিকের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য ডেটার গোপনীয়তা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিক ডেটা ও সাইবার হুমকি এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো ইস্যুগুলো নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন, যার মাধ্যমে শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের (stakeholder) জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। তথ্য সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর পক্ষে সমর্থন করে সাংবাদিক একটি নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা (ecosystem) তৈরিতে অবদান রাখতে পারেন।

একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যাত্রায় গল্পকার, প্রহরী এবং পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে সাংবাদিকের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে সাংবাদিকের ভূমিকা ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। স্মার্ট সোসাইটি উদ্যোগের সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করার মাধ্যমে সাংবাদিক এ রূপান্তরমূলক যাত্রার সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও প্রভাবগুলোর বিষয়ে জনসাধারণের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। ভুল তথ্য ও গুজব পরিবেশন থেকে বিরত থেকে তা রোধে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে তারা নাগরিকের ক্ষমতায়ন, উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত এবং জাতিকে একটি উজ্জ্বল ও স্মার্ট ভবিষ্যতের দিকে চালিত করতে পারেন। তাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, শক্তিশালী সমর্থন এবং বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতার মাধ্যমে সাংবাদিক নাগরিকের ক্ষমতায়ন, অংশীজনের জবাবদিহির আওতায় আনতে এবং প্রযুক্তিগত পুনর্জাগরণ ও সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে জাতিকে তার রূপকল্পের দিকে চালিত করতে পারেন।

ভুল তথ্য ও গুজব পরিবেশন থেকে বিরত থেকে তা রোধে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে তারা নাগরিকের ক্ষমতায়ন, উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত এবং জাতিকে একটি উজ্জ্বল ও স্মার্ট ভবিষ্যতের দিকে চালিত করতে পারেন

লেখক: সিস্টেম অ্যানালিস্ট, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রবন্ধ

সুপরিকল্পনা ও নীতি সহায়তার ওপর গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ

রণজিৎ কুমার

যে কোনো কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর করে তার বাস্তবায়নে সুপরিকল্পনা ও নীতি সহায়তার ওপর। আমাদের সামনে এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মসূচি। নীতিনির্ধারকরা সুপরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি ও নীতি সহায়তায় প্রদান করায় এমন একটি আধুনিক কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এমন একটি সময়ে তিনি ২০৪১ সাল নাগাদ বুদ্ধিদীপ্ত, উদ্ভাবনী ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা বিনির্মাণের কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ঝড়ো গতিতে এগিয়ে আসছে। সংগত কারণে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রাধিকার বিবেচনায় কী থাকছে, তা ধারণাই করা যায়। প্রথমত পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্ব পাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয়ত, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং তৃতীয়ত, প্রয়োজনীয় কারিগরি ও নীতি সহায়তা প্রদান।

প্রশ্ন জাগতে পারে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মতো উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়ন সম্ভব কি না? কারণ, স্মার্ট বাংলাদেশের প্রায় সবকিছুই যেমন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে, যা মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে সরকার যে অত্যন্ত আন্তরিক, তা বোঝা যায় দ্রুত সময়ে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের একটি

মহাপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন থেকে। সম্পূর্ণ মহাপরিকল্পনা শর্টটার্ম, মিডটার্ম এবং লংটার্ম টাইমফ্রেমে সাজানো হয়েছে। বিস্তৃত পরিসরে না গিয়ে আমি সংক্ষেপে স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ যেমন: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটির ওপর আলোকপাত করছি।

স্মার্ট বাংলাদেশে একজন স্মার্ট সিটিজেন হবেন বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক এবং সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিক। প্রত্যেক নাগরিকের প্রযুক্তিতে অভিযোজন ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করা হবে। স্মার্ট সিটিজেন স্তম্ভের বাস্তবায়নে বেঁধে দেওয়া সময়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২৫ সালে নাগরিকদের ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ শতাংশ। আর ২০৩১ সালের মধ্যে তা হবে ৭৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৯০ শতাংশের বেশি। ২০২৫ সালে নাগরিকদের জন্য স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহারের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে ৬০ শতাংশ, ২০৩১ সালের মধ্যে ৮০ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ শতভাগ। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট পরিচয়পত্রের সর্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। নাগরিক যাতে ই-পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের সেবা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারেন, ২০২৫ সালের মধ্যে সে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে এবং 'ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান সিড' কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

স্মার্ট ইকোনমিতে গড়ে উঠবে ক্যাশলেস, সার্কুলার (বৃত্তাকার), উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি। আর্থিক লেনদেন হবে ক্যাশলেস। পণ্যের পুনর্ব্যবহার করে বৃত্তাকার অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে। ফলে শূন্য বর্জ্য উৎপাদন হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), রোবটিকস, ব্লকচেইন, ড্রোনসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রসর প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণা ও উদ্ভাবনী সমাধান হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। স্মার্ট অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশের বেশি ক্যাশলেস লেনদেন নিশ্চিত করা হবে। আর ২০৩১ সালের মধ্যে তা শতভাগে উন্নীত করা। ২০৪১ সালের মধ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের উন্নীত করা এবং দারিদ্র্যের হার শূন্যে নিয়ে আসা। ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিকে প্রাধান্য দিয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সের উন্নয়ন এবং ২০৪১ সালে ব্যাবসা সহজ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫টি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫টি এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৫০টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ গড়ে তোলা। ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চগতি ও নির্ভরশীল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার ৭০ শতাংশের বেশি করা এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা।

স্মার্ট গভর্নমেন্ট হবে নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক, কাগজবিহীন, উপাত্তনির্ভর, আন্তসংযুক্ত, আন্তচালিত, সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয়। যোগাযোগে কাগজের ব্যবহার হবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। অগ্রসর প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, বিচারব্যবস্থার মতো জরুরি খাতগুলো পরিচালিত হবে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে। স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্তম্ভের বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে: ২০২৫ সালের মধ্যে কাগজবিহীন, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা কাগজবিহীন ও পারসোনালাইজ করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা। ২০২৫ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাকের মাধ্যমে ৩০ শতাংশের বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা সহজলভ্য ও আন্তচলমান করা। ২০২৫ সালের মধ্যে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য স্মার্ট ড্যাশবোর্ড তৈরি করা, ২০৩১ সালের মধ্যে আন্তচালিত ড্যাশবোর্ড এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সরকারের সব সিদ্ধান্ত উপাত্তনির্ভর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর করা। জাতিসংঘ ই-গভ ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সাল নাগাদ একশর মধ্যে, ২০৩১ সালে সত্তরের মধ্যে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ পঞ্চাশের মধ্যে নিয়ে আসা। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০২৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করে ১২ শতাংশের বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৭ শতাংশের বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২২ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা।

স্মার্ট সোসাইটি স্তম্ভে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ সহনশীল সমাজ, যা হবে নিরাপদ ও টেকসই। ডিজিটালি কানেকটেড সোসাইটিতে জাতি, ধর্ম, বয়স, পেশা, সামাজিক অবস্থান–নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। আর্থিক-সহ সব ধরনের সেবায় নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে যেসব লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম ২০২৫ সালের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ৫০ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে তা শতভাগে উন্নীত করা। ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা দেওয়া হবে। গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ৩০তম। লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালে প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে উন্নীত করা। স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম–এ সূচকে ২০২৫ সালের মধ্যে 'ডিজিটালি নেটিভ' হওয়া, ২০৩১ সালের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে সবার জন্য ডিজিটাল অ্যাকসেস সুবিধাসম্পন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা এবং গ্লোবাল ইকুয়ালিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও ২০৪১ সালের মধ্যে সবার সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সহনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সব সরকারি কর্মকাণ্ডে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি সমাজ গড়ে তোলা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ১৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব উপকমিটি মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে চার স্তম্ভভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রস্তাব করছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভায় আলোচনার পর স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

আমরা জানি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একটা শক্ত ভিত তৈরি করেন। সেই ভিতের ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে বাংলাদেশকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ২০৪১ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, সমৃদ্ধ, উদ্ভাবনী ও উচ্চ অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করে নানা উদ্যোগের বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। অতীতের মতোই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়নে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ফলে ইতোমধ্যে মানুষের মনে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। তাই তাদের নেতৃত্ব ও দক্ষতা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাফল্য বয়ে আনবে–এমন প্রত্যাশা অনেকেরই।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

প্রবন্ধ

ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের চাবিকাঠি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর

মানবসভ্যতার বয়স কমপক্ষে সাড়ে তিন লাখ বছর। হোমো স্যাপিয়েন্স তথা আধুনিক মানুষ এই সাড়ে তিন লাখ বছর আগে প্রাইমেট বর্গের অন্তর্গত হোমিনিডি গোত্রের গণে অন্তর্গত Homo sapiens-এর আবির্ভাব ঘটেছিল আফ্রিকার মরোক্কোর জেবেল ইরহোদে (Jebel Irhoud)। প্রাথমিক জীবন যাযাবরের। বিভিন্ন আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে ধীরে ধীরে উৎকর্ষের দিকে নিতে থাকে।

আগুন ও চাকার আবিষ্কার মানবসভ্যতার বাতিঘর

মানবসভ্যতায় বিপ্লব নিয়ে আসে আগুন ও চাকার আবিষ্কার। নির্ভরযোগ্য কার্বন টেস্ট অনুযায়ী ফসিল রেকর্ডে আগুনের দেখা মেলে ৪২০ মিলিয়ন বছর আগে। চাকাকে বলা যায় সভ্যতার গতি। মানুষের ধীরগতির জীবনে গতি আনে চাকা। চাকা আবিষ্কার হওয়ার আগে মানুষ নিজেই বইত তার যাবতীয় ভারের বোঝা। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব সাড়ে তিন থেকে তিন হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কার হয় এ চাকা। সভ্যতা এরপর দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে।

শিল্পবিপ্লব ও সভ্যতার রূপান্তর

আগুন ও চাকা আবিষ্কারের পর মানবসভ্যতায় বড়ো পরিবর্তন আসে আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে কৃষি আবিষ্কারের মাধ্যমে। মানুষ স্থায়ীভাবে এক জায়গায় থাকা শুরু করে। যূথবদ্ধ স্থায়ী জায়গায় বসবাসের হাত ধরে ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখন পর্যন্ত তিনটি শিল্পবিপ্লব শেষ হয়েছে এবং চতুর্থটি চলমান। পঞ্চম আসি আসি করছে। যদিও শিল্পবিপ্লবগুলো নতুনটি শুরু হলে আগের শিল্পবিপ্লবটি শেষ হয় না। দার্শনিকরা বিপ্লবকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করলেও মোটা দাগে বিপ্লব হচ্ছে 'আমূল পালটে দেওয়া'।

প্রথম শিল্পবিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে যান্ত্রিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের শিল্পজগতে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তা প্রথম শিল্পবিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত। কায়িক শ্রম ছাড়া বা অতি কম কায়িক শ্রমে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও জলশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা হয়। ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে সূচিত এ বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ক্রমশ শক্তিশালী বুর্জোয়ায় রূপান্তর করে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের ভিত্তি তৈরি করে। বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে প্রথম বিপ্লবটা শুরুতে ব্রিটেনে, পরে আহমেদাবাদ ও জাপানে পরিলক্ষিত হয়। বস্ত্রশিল্প ছাড়াও লৌহশিল্প, কৃষি ও খনি খননকাজে এ বৈপ্লবিক ধারা পরিব্যাপ্ত হয়। আমেরিকায় তা ১৭৬০ থেকে ১৮২০ বা ১৮৪০ সালের মধ্যে ঘটে যায়।

দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব

সভ্যতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে বিদ্যুৎ। আবিষ্কার হয় ১৮৭০ সালে। ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ এবং টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবকে বেগবান করে। স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভব ছিল এর সহযোগী। এ বিপ্লবের কারণে হাতের কাজ আরও বেশি মাত্রায় মেশিন দখল করে নিতে থাকে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে ওয়ান অব টেকনোলজির জায়গায় মাস প্রোডাকশন টেকনোলজি ব্যাপকতা পেতে শুরু করে। এর পরের ধাপকে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তৃতীয় শিল্পবিপ্লব

তৃতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুফলস্বরূপ বিশ্বে মহামন্দার সূচনা হয়; বেকারত্ব চরম রূপ ধারণ করে, আয়-উপার্জন কমতে থাকে, জীবনযাত্রার ব্যয় হয় উর্ধ্বগামী, যার কারণে ডিজিটাইজেশনকে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। (চৌধুরী, ড. আবদুল মান্নান: 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ', ভোরের কাগজ, ২৮ মার্চ ২০২৪)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কম্পিউটার প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর, মাইক্রোচিপস ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ও আণবিক শক্তিসহ অন্যান্য উদ্ভাবন নিয়ে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব। কম্পিউটার ও সুপার কম্পিউটার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবাদান সম্ভব হয়। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষত ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে যন্ত্রপাতি আরও অধিক হারে মানবশক্তির জায়গা দখল করতে শুরু করে। ১৯৬৯ সালে পৃথিবীর অনেক দেশে এ বিপ্লবের সূচনা হলেও আমাদের দেশ পর্যন্ত তা পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

আগের তিনটি শিল্পবিপ্লবকে ছাড়িয়ে গেছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াব তার লেখা 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' গ্রন্থে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণা সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন। যদিও এরও আগে ২০১১ সালে একদল জার্মান বিজ্ঞানী শিল্প-কলকারখানাগুলোয় কীভাবে অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা যায় বা ডিজিটাল কৌশল প্রয়োগ করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যেখানে কম জনবল দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পণ্য উৎপাদন সহজ হবে, সেখান থেকেই মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ধারণাটির উদ্ভব।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো ইত্যবসরে ২০১১ সালে জার্মানিতে একটি উচ্চতর প্রযুক্তিগত কৌশলের উদ্ভব ঘটে, যাকে 'ইন্ডাস্ট্রি ৪' নামে অভিহিত করা হয়। জার্মান সরকারের ক্রমসম্প্রসারিত প্রয়াসের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। 'ইন্ডাস্ট্রি ৪' কৌশলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত ফ্লেক্সিবল উৎপাদনের (বৃহৎ আকারে) শর্তে কাস্টমাইজেশন, সেলফ অপটিমাইজেশন, সেলফ কনফিগারেশন, সেলফ ডায়াগনসিস, কগনিশনের প্রবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান জটিল কাজে কর্মীদের বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় প্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয়করণ প্রযুক্তির বিকাশ। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা 'ইন্ডাস্ট্রি ৪' হচ্ছে আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্পব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্বপর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ ও নিরূপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরি করার জন্য বড়ো আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (এমটুএম) এবং ইন্টারনেট অব থিংসকে (আইওটি) সংযোগ করা হয়।' এসবের কারণে বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগৎ একাকার হতে শুরু করেছে। শোয়াবের ভাষায় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার একত্রিত বা একীভূত করে এবং বায়োলজির পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের প্রচলনই হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। (চৌধুরী, প্রাগুক্ত)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন প্রযুক্তি, রোবোটিকস, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রো প্রসেসর, থ্রিডি প্রিন্টিং, ক্লাউড টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব পিউপল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ডিজিটাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস টেকনোলজি, সম্পূর্ণ স্বশাসিত, স্বচালিত যানবাহন ও মেকাট্রনিক্স প্রভৃতি হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি। যারা যত দ্রুত এ প্রযুক্তি হস্তগত করবে, নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনীতে সক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, তারাই টিকে থেকে ডারউইনের 'যোগ্যতরই টিকে থাকবে' তত্ত্বের সারবত্তা প্রমাণ করবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফরচুন ম্যাগাজিন ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচিত বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০ কোম্পানির প্রধান নির্বাহীদের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ এখন প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলা। স্মার্ট প্রযুক্তি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে অসাধ্যকেও সাধন করা যায়। যেমন: ২০২৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম প্রজন্মের প্রযুক্তিচালিত একটি উচ্চপ্রযুক্তির রোবটের সাহায্যে চীনের চিকিৎসকরা ৪ হাজার ৬৫০ কিলোমিটার দূরে বসে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একজন রোগীর পিত্তথলির সফল অপসারণ করেছেন। মূলত চেচিয়াং প্রদেশের হাংচৌয়ের একটি হাসপাতালে বসে জিনজিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের আরাল শহরের একজন নারীর অস্ত্রোপচার করেন চেচিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুল অধিভুক্ত স্যার রান রান শ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জন লিয়াঙ চিয়াও। তিনি জানান রোবটটির মূল সফটওয়্যার এবং চার হাতের এন্ডোস্কোপিক মডেলসহ মূল হার্ডওয়্যার চীন নিজেরাই তৈরি করেছে।

চ্যালেঞ্জ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে ১০-১৫টি টেকনোলজি (সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে) সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে। বাংলাদেশকে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অন্যথায় দারুণ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বেঁচে থাকা। প্রথম চ্যালেঞ্জ–মেশিন কর্তৃক মানব কর্মসংকোচন; দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ–টিকে থাকার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা এবং দক্ষতা উন্নয়নে নতুন কৌশল তৈরি করতে হবে, যা বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতে পারে এবং ৩য় চ্যালেঞ্জ–ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বাজারে টিকে থাকার জন্য তাদের প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে অনেক অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, যা তাদের জন্য কঠিন হবে। সরকারকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। যে কাজটি ইতোমধ্যে পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রভাবশালী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অগমেন্টেড ইন্টেলিজেন্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতা রয়েছে। অ্যামাজনের অ্যালেক্সা কিংবা অ্যাপলের সিরির

মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। এসবই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও অগমেন্টেড ইন্টেলিজেন্সের কাজ। অগমেন্টেড ইন্টেলিজেন্স আসলে মানুষের বুদ্ধিমত্তারই একটা বর্ধিত অংশ, যেখানে মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে মেশিনের ক্ষমতার এক দারুণ মিশ্রণ ঘটানো হয়। এরিক স্মিডের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্‌বেগ যেমন আছে, তেমনই আছে সম্ভাবনাও। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছেন যে, রোবট ২০৫০ সালের মধ্যে সব মানবিক কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে নানা ব্যাবসায়িক কাজে এর ব্যবহার বাড়ছে। এর বাইরে বেশি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিরক্ষা। বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিরক্ষা কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছে। আমরা আগেই আধা স্বয়ংক্রিয় ড্রোনের (চালকবিহীন বিমান) ব্যবহার দেখেছি। বর্তমান বিশ্বে বড়ো দুশ্চিন্তার নাম ডিপফেক। এতে কম্পিউটারে কারসাজি করা ছবিতে এক ব্যক্তির সাদৃশ্য অন্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি যেমন মানুষের কাজ সহজ করছে আবার কাজ কমিয়ে দিয়ে কর্মসংস্থান সংকুচিত করছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ঘাটতির কারণে বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ চাকরি হারাতে পারে। এ সংস্থার মতে, এ সময়কালে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চাকরিরত প্রায় ৫৭ লাখ অদক্ষ শ্রমিক এ প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থতার কারণে বেকার হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের আশঙ্কা নিঃসন্দেহে চিন্তার উদ্রেককারী। বিশেষত, বাংলাদেশে বর্তমানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী, বৈষম্য তৈরিকারী ও শ্লথগতির দারিদ্র্য হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। (তিতুমীর, রাশেদ আল মাহমুদ: 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব: সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি'; ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০, যুগান্তর)

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অনেক নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি করবে। এর জন্য প্রয়োজন 'পুনঃদক্ষতা (Re-skilling) এবং অধিকতর দক্ষতা (Up-skilling)। সুযোগ রয়েছে তরুণদের কাজে লাগানোর। বাংলাদেশে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের বয়স ২৪ বছরের নিচে। যারা চাইলে দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের ও দেশের আয় বাড়াতে পাড়ে। ফ্রিল্যান্সিং এবং ডিজিটাল কমার্স এর অন্যতম উদাহরণ। বিশ্বের ১৫৭ কোটি মানুষ ফ্রিল্যান্সিং করেন। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছর বা এর নিচে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সদের নীরব বিপ্লব হয়েছে। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণ-তরুণীরা ফ্রিল্যান্সিং করে মাসে কয়েক হাজার ডলার উপার্জন করছেন। বিশ্বের মোট ফ্রিল্যান্সারের বড়ো অংশ বাংলাদেশে। তারা দেশে বসে অনলাইনে বিভিন্ন কাজ করেন। বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ১৫৩টি মার্কেটপ্লেসে প্রায় ১০ লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করেন। বাংলাদেশ থেকে ফ্রিল্যান্সাররা মাত্র ১১টি বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং করেন। অথচ ১ হাজার ২৩টি বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং করার সুযোগ রয়েছে (প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০২৩)। আর ই-কমার্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, ২০২৩ সালে ই-কমার্সের আকার ছিল ৪১ হাজার কোটি টাকার (প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০২৩)। ২০২৬ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১ হাজার ৫০ কোটি ডলার। বর্তমান বাজারদরে এর পরিমাণ ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি (দৈনিক ইত্তেফাক: ২০ মে ২০২৩)। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মিলিয়ে কর্মসংস্থান ১০ লাখের বেশি।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগাতে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। মোট জনসংখ্যার ৫৮.৫ শতাংশ অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল এবং তাদের মধ্যে মাত্র ৫.৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষিত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের মাত্র ০.৩ শতাংশ কর্মসংস্থান হয়েছে। নতুন করে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বিপুলসংখ্যক দক্ষ লোক প্রয়োজন হবে। আগামী দিনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের স্মার্ট প্রযুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ জনবল দরকার হবে। যেখানে বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের খাতগুলো হতে পারে থ্রি-ডি ফ্যাশন ডিজাইনিং, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, আইওটি বিশেষজ্ঞ, শিল্প রোবট নিয়ে কাজ করার দক্ষ জনবল, বৃহৎ উপাত্ত (Big Data & Data Science), উচ্চতর কম্পিউটারভিত্তিক প্রকৌশল, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ও মডেলিং, এআর, ভিআর, সিমুলেশন প্রভৃতি। বরং দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজন হয় গুণগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। সরকার দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি বিশেষায়িত ফোরআইআর ল্যাব স্থাপন করেছে। দেশের বিভিন্ন সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বা হাই-টেক পার্কে স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বর্তমানে ১৬৬টি কোম্পানি কাজ করছে।

মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বা ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়গুলো হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সমাজে বৈষম্য তৈরি করতে পারে। যেমন 'কমদক্ষতা স্বল্প বেতন' বনাম 'উচ্চদক্ষতা উন্নত বেতন' কাঠামো অর্থনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করবে। তবে নানা ধরনের নতুন কর্মসংস্থানের বিশাল এক দুয়ারও উন্মোচিত হবে। (চৌধুরী, প্রাগুক্ত)

> কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন প্রযুক্তি, রোবোটিকস, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রো প্রসেসর, থ্রিডি প্রিন্টিং, ক্লাউড টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব পিউপল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ডিজিটাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস টেকনোলজি, সম্পূর্ণ স্বশাসিত, স্বচালিত যানবাহন ও মেকাট্রনিক্স প্রভৃতি হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অবকাঠামো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন অ্যানালাইটিক্স, নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট ও স্মার্ট ডিভাইস উন্নয়ন বাধার মুখে পড়ছে দুর্বল অবকাঠামোর কারণে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন দুর্বলতা এখনো প্রকট। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের তথ্যমতে, বর্তমানে ই-কমার্সের ১০০০টি সাইট রয়েছে এবং ফেসবুকে ৮ হাজার পেজ রয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সেবা ও আর্থিক লেনদেন অনলাইনে করছে। তাছাড়া মোবাইলে আর্থিক সেবা আদান-প্রদানকে সহজ করেছে। কিন্তু এখনো চার কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিপরীতে মাত্র ৮৩ লাখ ডেবিট কার্ড ব্যবহার হয়।

বর্তমানে বৃহৎ উপাত্ত বা বিগ ডেটা নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছে। ডেটা ব্যক্তিগত সম্পদ বা পাবলিক গুডস। জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করে যাতে কেউ একচেটিয়া ব্যাবসা না করতে পারে, তা নিয়ে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ভুল প্রয়োগের কারণে নাগরিকদের মানবাধিকার অনেক সময় ক্ষুণ্ন হতে পারে। সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সবাইকে। অনেক প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ে উদ্‌বেগ তৈরি হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোনজাতীয় প্রযুক্তিগুলো মানবাধিকার, সার্বভৌমত্ব এবং নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার উদাহরণও রয়েছে। মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে এবং দুর্বল দেশের

সার্বভৌমত্ব ঝুঁকিতে ফেলছে। অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, ট্রেড ইউনিয়ন, শিশু-অধিকার সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল হুমকি এবং আক্রমণের শিকার হচ্ছে। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহার বন্ধ না করা গেলে ভবিষ্যতে রোবটিক যুদ্ধেরও আশঙ্কা থেকে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৈশ্বিক পর্যায়ে বহুপাক্ষিক বাধ্যবাধকতাযুক্ত চুক্তি দরকার। ফলে প্রযুক্তিগত রূপান্তরকে ধ্বংসের অস্ত্র হিসাবে নয় বরং মানুষের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

সাইবার নিরাপত্তা

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়েই সাইবার নিরাপত্তা বা তথ্যের সুরক্ষা একটি বড়ো উদ্‌বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বড়ো বিপদে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে একাধিক সাইবার হামলা ও তথ্য চুরির পাশাপাশি কয়েক দফায় বিপুল পরিমাণ অর্থ লোপাট ঘটনার পর সেই উদ্‌বেগ আরও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ২০১৬ সালে ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়ে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় ঢুকে পড়া ওই হ্যাকারদের লক্ষ্য ছিল কমপক্ষে ১০০ কোটি ডলার চুরি করার। এর আগে ২০১৪ সালে সোনালী ব্যাংক থেকে দুই কোটি টাকা চুরি করে তুরস্কের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নেওয়া হয়। এছাড়া ২০১৯ সালে দেশের বেসরকারি তিনটি ব্যাংকের ক্যাশ মেশিন থেকে ক্লোন করা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ৩০ লাখ ডলার হাতিয়ে নেয় অপরাধীরা (লিখন, নাজমুল: 'সাইবার নিরাপত্তায় গলদ, বাড়ছে ঝুঁকি', দেশরূপান্তর, ১০ অক্টোবর ২০২৩)। বাংলাদেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক স্ক্যাম, ফিশিং, অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং, অনলাইনে অপতথ্য, হয়রানি বা প্রতারণা, ব্যক্তিগত তথ্য চুরি এবং ঘৃণা বা বৈষম্যের শিকার হওয়ার ঘটনা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত হিসাব বলছে, সাইবার অপরাধের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে ৭৫ শতাংশ ভুক্তভোগীর বয়সই ১৮ থেকে ৩০ বছর। প্রকাশিত প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, দেশে সাইবার অপরাধের প্রবণতা ৩৮১ শতাংশ বেড়েছে। ২০২০ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে নারী ভুক্তভোগীরা ২২ হাজার ৩০৪টি সাইবার অপরাধের অভিযোগ দাখিল করেছেন। সাইবার পুলিশিং সেন্টার প্রতিদিন গড়ে দুই শতাধিক অভিযোগ পেয়েছে, যার বেশির ভাগই অনলাইনে হয়রানিবিষয়ক। ২০২২ সালে অ্যাকশনএইডের প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে আসে, ৬৪ শতাংশ নারীই অনলাইন সহিংসতার শিকার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বছরের ব্যবধানে বহু ধরনের সাইবার অপরাধের মাত্রা ২৮১ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেড়েছে (সমকাল, ৩ এপ্রিল ২০২৪)।

স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা

২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী একটি রূপকল্প নির্ধারণ করে দিয়েছেন জাতির জন্য। তা হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২৩-এর উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট জাতি গঠনই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য।' ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে যখন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ ঘোষণা করেন, তখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশি-বিদেশি বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী মহলে সবার মধ্যে ছিল অপার কৌতূহল, যা নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়েনি অনেকেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পর সংগত কারণে অনেকের মনেও আবারও কৌতূহল জন্ম নিল এরপর কী হবে? রূপকল্প ২০২১-এর নির্ধারিত সময় ১৩ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যখন অনেকটাই সফল, তখন প্রত্যাশা বেড়েছে আকাশসম। অবশ্য এ কৌতূহলের অবসান হতে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর প্রায় আট মাস পর ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের। তিনি বলেন, 'আমরা ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলব। আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।' তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের কথা– (১) স্মার্ট সিটিজেন, (২) স্মার্ট গভর্নমেন্ট, (৩) স্মার্ট ইকোনমি এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি।

ক. ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আদর্শগত রূপান্তর ঘটবে।
খ. চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো হবে এই রূপান্তরের হাতিয়ার।
গ. সব সেবার ভিড়ে না হারিয়ে নাগরিকরা নিজের প্রয়োজনীয় সেবা সহজে খুঁজে পাবেন।
ঘ. সেবাগ্রহীতার দায় নয়, সেবা প্রদানকারীর দায়কে শক্তভাবে দেখা হবে।
ঙ. সরকারি সেবা প্রদানকে দেখা হবে নাগরিককের চোখে, সেবাদাতার চোখে নয়।
চ. সরবরাহকেন্দ্রিক থেকে চাহিদাকেন্দ্রিক সার্ভিস জোগান।
ছ. নাগরিককে এখন ডিজিটাল মাধ্যমেও নানা চ্যানেলে (অ্যাপ, ওয়েব, কল সেন্টার প্রভৃতি নানা প্ল্যাটফরম ব্যবহার করতে হয়) সেবা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে একটি মাত্র প্ল্যাটফরম থেকে নাগরিকরা সব চাহিত সেবা পাবেন। নানা পরিচয় নম্বরের (যেমন এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন নম্বর প্রভৃতি) পরিবর্তে একটি পরিচয় নম্বর (ইউনিক আইডি) দিয়ে সব কার্যক্রম সম্পাদন।

প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের সিদ্ধান্তের পর এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে বর্তমান সরকার। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের জন্য ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গঠিত হয়েছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'। 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'-এর নয়টি কার্যপরিধিও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যথা:

১. অগ্রসর তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান;
২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান;
৩. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিধিবিধান প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান;
৪. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
৫. এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরিজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
৬. ব্লেন্ডেড এডুকেশন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ফাইভজি সেবা চালু-পরবর্তী সময়ে ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিবেচনায় চতুর্থ সাবমেরিন কেব্‌লে সংযোগের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
৭. রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মেড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিকনির্দেশনা প্রদান;
৮. আর্থিক খাতের ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং
৯. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান।

(সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২২ সালের ১৬ আগস্টের প্রজ্ঞাপন নং ১৪৯)।

টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটি' গঠন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে। নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে:

> মূল কথা হচ্ছে আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), রোবটিকস, ব্লকচেইন, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রি-ডি প্রিন্টিং-এর মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, পরিবহণ, পরিবেশ, শক্তি ও সম্পদ, অবকাঠামো, অর্থনীতি, বাণিজ্য, গভর্ন্যান্স, আর্থিক লেনদেন, সাপ্লাই চেইন, নিরাপত্তা, এন্ট্রাপ্রেনারশিপ, কমিউনিটিসহ নানা খাত অধিকতর দক্ষতার দ্বারা পরিচালনা করা হবে

১. বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সুপারিশ প্রদান;
২. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সব পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
৪. স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৬. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিধিবিধান প্রণয়ন;
৭. রপ্তানির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'মেড ইন বাংলাদেশ' পলিসি প্রণয়ন এবং সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮. আর্থিক খাতের ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।

(সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপন নং ১৮২)।

কেমন হবে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ? কীভাবেই বা তৈরি করা হবে স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকা এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসালটিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযোগিতায় ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১'। এস্তোনিয়ার 'ই-আইডি', ভারতের 'আধার কার্ড', কোরিয়ার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নীতি ও উদ্যোগসহ যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী বিভিন্ন দেশের উত্তম পদক্ষেপগুলো (বেস্ট প্র্যাকটিস) ভালো করে যাচাই করে এ মাস্টারপ্ল্যানটি তৈরি করা হয়েছে, যার মূল কথা হচ্ছে আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), রোবটিকস, ব্লকচেইন, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রি-ডি প্রিন্টিং-এর মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, পরিবহণ, পরিবেশ, শক্তি ও সম্পদ, অবকাঠামো, অর্থনীতি, বাণিজ্য, গভর্ন্যান্স, আর্থিক লেনদেন, সাপ্লাই চেইন, নিরাপত্তা, এন্ট্রাপ্রেনারশিপ, কমিউনিটিসহ নানা খাত অধিকতর দক্ষতার দ্বারা পরিচালনা করা হবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে গড়ে তোলার প্রকল্পসহ ৪০টি মেগা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা।

সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণ করছে। এ পরিকল্পনা ও নীতি-কৌশলে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে। প্রযুক্তিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রবেশগম্যতা ও অভিযোজন, যা স্মার্ট বাংলাদেশের চার স্তম্ভের বাস্তবায়ন এগিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে ১৪ দফার কর্মপরিকল্পনাও।

স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনে ১৪ দফা কর্মপরিকল্পনা

১. একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী দেশ হিসাবে গড়ে তোলা;
২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়তে এবং অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনতে আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;
৩. শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে 'এক শিক্ষার্থী, এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্ন'-এর অধীনে শিক্ষার্থীদের জন্য স্থায়ী ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম;
৪. একটি স্মার্ট এবং সর্বব্যাপী সরকার গড়তে ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন করা;
৫. আগামীর স্টার্ট-আপ শিক্ষাবিদদের জন্য ইন্টারেক্টিভ স্কুল স্থাপন;
৬. কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জিডিপিতে অবদান বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগবান্ধব স্টার্ট-আপ সহায়তা;
৭. নলেজ ডেভেলপমেন্ট পার্ক নির্মাণ;
৮. সেন্টার ফর লার্নিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব নলেজ (Center for Learning Innovation and Creation of Knowledge-CLICK) স্থাপন;
৯. অ্যারোনটিক্যাল এবং স্পেস হরিজন বিষয়ে জ্ঞানের জন্য ফাউন্ডেশন তৈরি করা;
১০. স্বকর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য (Self-Employment and Entrepreneurship Development-SED) প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা;
১১. সার্ভিস অ্যাগ্রিগেটর ট্রেনিং (Service Aggregator Training-SAT) মডেলে সরকারি পরিষেবা এবং অবকাঠামোভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরি করা;
১২. কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে সব ডিজিটাল পরিষেবা আনয়ন (মাইগভ);
১৩. ডেটা সিকিউরিটি অ্যাক্ট, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (Sheikh Hasina Institute of Frontier Technology-SHIFT) অ্যাক্ট, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ একাডেমি (Innovation Design and Entrepreneurship Academy IDEA) এবং
১৪. ডিজিটাল সার্ভিস অ্যাক্ট, এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরিজন আইন এবং ডিজিটাল লিডার তৈরির উদ্যোগ।

গত বছর (২০২৩) ৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের প্রথম সভা। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানো এবং তরুণ সমাজকে যথাযথভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা। এছাড়াও অন্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রযুক্তির দ্রুত বিবর্তনশীলতা, বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস, সাইবার অপরাধ, বৈশ্বিক বিগ-টেক প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্য এবং ডিমান্ড ইকোনমি বা চাহিদা অর্থনীতির মোকাবিলা করা। ডিজিটাল ডিভাইড মোকাবিলা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানির সংস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করা।

সভায় স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নসহ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়:

১. **স্মার্ট নাগরিক:** সভায় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক স্মার্ট নাগরিকের বৈশিষ্ট্যসূচক এবং সূচকগুলোর স্বল্পমেয়াদি (২০২৫), মধ্যমেয়াদি (২০৩১) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১) লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে:

ক. স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট নাগরিক গঠনে ডিজিটাল দক্ষতার সূচক ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ, ২০৩১ সালের মধ্যে ৭৫ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশের অধিক উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

খ. স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০, ২০৩১ সালের মধ্যে ৮০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

গ. নাগরিক সেবা গ্রহণে স্মার্ট আইডির সর্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্মার্ট আইডির সর্বজনীন ব্যবহার শতভাগে উন্নীত করা;

ঘ. শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতাকে সংযুক্ত করে সময়াবদ্ধ ব্লেন্ডেড শিক্ষা ও দক্ষতা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্লেন্ডেড শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স এবং এর আওতায় গঠিত ১২টি উপকমিটির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

২. **স্মার্ট অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারিত হয়**

ক. ক্যাশলেস লেনদেন ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশের বেশি এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১২ হাজার ৫০০ ইউএসডি এবং দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোঠায় আনা;

খ. ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিকে প্রাধান্য দিয়ে Centre of Excellence-এর উন্নয়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ব্যাবসা সহজ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা;

গ. ২০২৫ সালের মধ্যে ৫টি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫টি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০টি ইউনিকর্ন স্টার্ট-আপ স্থাপন;

ঘ. ব্যাবসায়িক সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে একটি কার্যকর সেবা প্ল্যাটফরম তৈরির মাধ্যমে ব্যাবসা সহজ করার আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ অবস্থানের উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া ২০৩১ সালের মধ্যে ব্যাবসা সহজ করার মাধ্যমে জিডিপিতে ৩ শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ ও ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির আঞ্চলিক রপ্তানি হার হিসাবে গড়ে তোলা এবং

ঙ. উচ্চগতি ও নির্ভরশীল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি উন্নীত করতে হবে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা।

৩. **স্মার্ট সরকারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়**

ক. ২০২৫ সালের মধ্যে কাগজবিহীন, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা কাগজবিহীন ও পারসোনালাইজ করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তি-চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা প্রদান করা;

খ. ২০২৫ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাকের মাধ্যমে ৩০ শতাংশের বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা সহজলভ্য ও আন্তচলমান করা;

গ. ২০২৫ সালের মধ্যে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য স্মার্ট ড্যাশবোর্ড তৈরি, ২০৩১ সালের মধ্যে আন্তপরিচালিত ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিনির্ভর ড্যাশবোর্ড এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও এআই-নির্ভর করা;

ঘ. প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের মধ্যে ১২ শতাংশের বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৭ শতাংশের বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২২ শতাংশের বেশি নির্ধারণ করা।

৪. **স্মার্ট সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যগুলো হচ্ছে**

ক. ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশের অধিক এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ আর্থিক অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করা। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তি-চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে;

খ. গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০তম, ২০৩১ সালের মধ্যে প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ. স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম–এই সূচকে ২০২৫ সালের মধ্যে 'ডিজিটালি নেটিভ' হওয়া, ২০৩১ সালের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও এআই-নির্ভর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঘ. ২০২৫ সালের মধ্যে সমাজব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ যেখানে সব বয়স, ধর্ম, শারীরিক সক্ষমতা ও শ্রেণি-পেশার মানুষ ডিজিটাল অ্যাকসেস সুবিধাসম্পন্ন এবং গ্লোবাল ই-কুয়ালিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ।

ঙ. এছাড়াও ২০৩১ সালের মধ্যে বয়স, ধর্ম, বর্ণ এবং শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সবার সহাবস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে ডিজিটালভাবে সহনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সরকারি কর্মকাণ্ডে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা।

উপরিউক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সভা থেকে অধিকতর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে ১৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৮৫) বার্নার্ড লোন বলেন, 'যিনি অদৃশ্যকে দেখতে পারেন, তিনিই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।' বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুকন্যা সেই অদৃশ্য দেখতে পারেন। তাই বঙ্গবন্ধু চিরকাল পরাধীন এ ভূখণ্ডকে স্বাধীন করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি অনুন্নত দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার পাশাপাশি এনালগ বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করেছেন। ২০৪১-এ করবেন স্মার্ট বাংলাদেশ। সবাই আমরা সেই যাত্রার সারথি হই এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করি।

[**দায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** এ লেখার মূল উপাদান এসেছে অনেক গুণী লেখকের লেখা থেকে। মোটা দাগে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের লেখা পড়ে নিজের মতো করে উপলব্ধি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সবার নাম উল্লেখ করতে না পারলেও তাঁদের কাছে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন।]

লেখক: বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

প্রবন্ধ

সাংবাদিকতার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)

ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর অন্তর্ভুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানের ফ্ল্যাগশিপকে সামনে রেখে ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি–সর্বত্র অটোমেশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে নাগরিকের জন্য সরবরাহ করা সকল পাবলিক পরিষেবায় ই-গভর্ন্যান্স এবং ই-গভর্নমেন্টের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়। বেসরকারি খাতের বেশির ভাগ কোম্পানি এবং এসএমই এখন আইসিটি টুলের মাধ্যমে সেবা দিচ্ছে। এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের দোরগোড়ায়, ঘরে বসে সেবা পাওয়া সহজ হয়েছে। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ (কেবিএস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশি শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু দক্ষতার মাপে বাংলাদেশে শ্রমিকদের অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের ধারণা (কেবিএস) খাটিয়ে/পরিশ্রমী কর্মী থেকে সফট কর্মীতে রূপান্তরিত করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ শ্রমঘন দেশ থেকে উন্নত জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, প্রযুক্তি ব্যবহার করেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলবে এবং সরকার হবে (প্রযুক্তিগতভাবে) স্মার্ট।' স্মার্ট বাংলাদেশ উদ্যোগের আওতায় বাংলাদেশ হবে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি (কেবিই) এবং উদ্ভাবনী দেশ এবং রূপকল্প ২০৪১ মানে স্মার্ট বাংলাদেশ।

স্মার্ট বাংলাদেশের মূল ধারণা একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিমান, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ পাওয়া। স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের চারটি উপাদান:

- স্মার্ট সিটিজেন (ই-নাগরিক)
- স্মার্ট সোসাইটি (ই-সোসাইটি)
- স্মার্ট ইকোনমি (ই-ইকোনমি)
- স্মার্ট সরকার (ই-গভর্নমেন্ট)

বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ডিজিটাল বিপ্লব ঘটেছে। বাংলাদেশে পরিচালিত দেশি ব্যাংকগুলোয় কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। গ্রাহকরা সাধারণত ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য চেক ব্যবহার করেন। একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য কাগজের পরিবর্তে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ই-চেক ইস্যু করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন হবে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন লেনদেনের মাধ্যমে। ওয়েবভিত্তিক অ্যাপগুলো এখনই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে সাহায্য করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বলতে 'চিন্তা করতে দক্ষ' কম্পিউটারকে বোঝায়। এআই ডেটা প্রক্রিয়া করতে, জটিল নিদর্শন শনাক্ত করতে, সিদ্ধান্তে আসতে এবং পরামর্শ দিতে সক্ষম। ফোনের স্বতঃসংশোধিত বৈশিষ্ট্য চালানো এবং বিপুল পরিমাণে অসংগঠিত ডেটাতে প্যাটার্ন খোঁজা-সহ বিভিন্ন কাজের জন্য এআই ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্র, যেখানে একটি মেশিনের পক্ষে স্বাধীনভাবে একটি নির্দিষ্ট কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এআই ব্যবহার শুরু করেছে। সুপরিচিত রাইড শেয়ারিং কোম্পানি যেমন PATHAO এবং SHOHOZ দ্বারা সর্বোত্তম রুট, রাইড ফি এবং অন্য বিষয়গুলোর সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে এআই ব্যবহার করা হয়। 'Alex' নামক একটি ভার্চুয়াল সহকারী অস্ট্রেলিয়ান সরকারের জন্য কাজ করে এবং যার সহায়তায় ৮১ শতাংশ মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বাংলাদেশের অধিবাসীরা এই ধরনের ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হবে।

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার

নিম্নলিখিত উদীয়মান প্রযুক্তি (এআইভিত্তিক) সাংবাদিকতা খাতে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১. **স্বয়ংক্রিয় লেখা:** এআই পরিচালিত ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেশন (এনএলজি) সিস্টেম স্ট্রাকচার্ড ডেটা সেট বা টেমপ্লেট থেকে সংবাদ নিবন্ধ, প্রতিবেদন এবং সারাংশ তৈরি করতে পারে। এটি আর্থিক উপার্জনের প্রতিবেদন, খেলাধুলার রিক্যাপ বা আবহাওয়ার আপডেটের মতো রুটিন রিপোর্ট তৈরির জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।

২. **বিষয়বস্তু কিউরেশন ও ব্যক্তিগতকরণ:** এআই অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীর পছন্দ, আচরণ এবং সামগ্রিক ব্যবহারের ধরন বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত নিউজ ফিডে বিষয়বস্তু সুপারিশ করতে পারে। এটি সাংবাদিক এবং সংবাদ সংস্থাকে তাদের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট শ্রোতাদের উপযোগী করতে, পাঠক/শ্রোতাদের আরও ব্যস্ত রাখতে এবং পাঠকের সন্তুষ্টি বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. **ফ্যাক্ট চেকিং ও যাচাইকরণ:** এআই টুল সাংবাদিকদের তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে এবং ভুল তথ্য বা জাল খবর শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এনএলপি) অ্যালগরিদম সংবাদের উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্লেষণ করতে পারে, বিশ্বস্ত সূত্রের সঙ্গে ক্রস-রেফারেন্স তথ্য এবং সংবাদ নিবন্ধে অসংগতি বা পক্ষপাতিত্ব চিহ্নিত করতে পারে।

৪. **ডেটা মাইনিং ও বিশ্লেষণ:** এআই পরিচালিত ডেটা মাইনিং এবং বিশ্লেষণের সরঞ্জাম সাংবাদিকদের বৃহৎ আকারের কাঠামোগত এবং অসংগঠিত ডেটা উৎস থেকে অন্তর্দৃষ্টি, প্রবণতা ও প্যাটার্ন উন্মোচন করতে সহায়তা করে। এটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ডেটা পরিচালিত গল্প বলা এবং নির্বাচনের ফলাফল, অর্থনৈতিক প্রবণতা বা সামাজিক ঘটনার মতো জটিল বিষয়ের গভীর বিশ্লেষণ সক্ষম করে।

৫. **স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সক্রিপশন ও অনুবাদ:** এআই-ভিত্তিক স্পিচ রিকগনিশন এবং মেশিন ট্রান্সলেশন প্রযুক্তিগুলো রিয়েল টাইমে ইন্টারভিউ, বক্তৃতা এবং প্রেস কনফারেন্সে প্রতিলিপি করতে পারে, যা সাংবাদিকের জন্য ওইসব ইভেন্টকে সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে ক্যাপচার ও রিপোর্ট করা সহজ করে দেয়। এটি বহুভাষিক প্রতিবেদনের সুবিধাও দেয় এবং সংবাদ সংস্থাকে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করে।

৬. **শ্রোতা এনগেজমেন্ট ও ফিডব্যাক বিশ্লেষণ:** এআই অ্যালগরিদম শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া, মন্তব্য এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারঅ্যাকশন বিশ্লেষণ করে পাবলিক সেন্টিমেন্ট, উদীয়মান প্রবণতা শনাক্ত করতে এবং শ্রোতাদের পছন্দ বুঝতে সহায়তা করতে পারে। এ প্রতিক্রিয়া সাংবাদিকদের তাদের শ্রোতাদের সঙ্গে আরও ভালোভাবে অনুরণিত করার জন্য এবং তাদের প্রতিবেদন ও বিষয়বস্তু, কৌশল তৈরি করতে সহায়তা করে।

৭. **বিষয়বস্তু সংযম ও সম্মতি:** এআই পরিচালিত সামগ্রিক মডারেশন সিস্টেম সম্পাদকীয় নির্দেশিকা এবং সম্পাদকীয় আদর্শ মানের সঙ্গে সম্মতি নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারীর কনটেন্ট, মন্তব্য এবং আলোচনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিল্টার ও পরিমিত করতে পারে। এটি সংবাদ প্ল্যাটফরম এবং সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলোর মধ্যে একটি আদর্শ ও সম্মানজনক অনলাইন সমতাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৮. **ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস:** এআই অ্যালগরিদম ভবিষ্যতের ঘটনা, উন্নয়ন ও বাজার গতিশীলতার পূর্বাভাস দিতে ঐতিহাসিক ডেটা এবং বর্তমান প্রবণতা বিশ্লেষণ করে। সাংবাদিক এ অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে সংবাদের যোগ্য ইভেন্টগুলোর পূর্বাভাস দিতে, পূর্বনির্ধারিত গবেষণা পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারেন।

সাধারণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাংবাদিকতাকে বিশ্বব্যাপী দর্শকের জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়তা, বর্ধিত দক্ষতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে আরও ভালো সংবাদ এবং এর গুণমান ও প্রাসঙ্গিকতার ব্যবহারে রূপান্তরিত করছে। যাই হোক, এআই প্রযুক্তি দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এবং জনস্বার্থে সাংবাদিকতার সততা, নৈতিক মান, উন্মুক্ততা এবং মানবিক তত্ত্বাবধান অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। ওপরের প্রতিটি প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দিগন্তকে প্রসারিত করবে। বাংলাদেশের স্মার্ট পেশাদাররা তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন। অধুনাকালে এ প্রযুক্তির সর্বোত্তম প্রয়োগের জন্য অনেক গবেষণা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুদ্ধিমান মানবসম্পদ গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রতিটি কর্মী হবে প্রযুক্তিবন্ধু। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সম্পদ হলো স্মার্ট কর্মীরা। তরুণদের বিশাল সংখ্যা একটি সম্পদ হতে পারে। একটি স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন স্মার্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা। প্রযুক্তিবন্ধু কর্মীদের বহুমাত্রিক জ্ঞানভিত্তিক সফট স্কিল একটি স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের মূল চাবিকাঠি।

লেখক: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), এনএপিডি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইনগত সংস্কার ও উদ্ভাবন

এ কে এম শাহনেওয়াজ চৌধুরী

২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তা ইতোমধ্যে আমরা অর্জন করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জিং এবং কার্যকর যাত্রা যখন সফলভাবে শেষ হলো, ঠিক তখনই ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, সেটি পূরণে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা করছেন। তিনিই প্রথম স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চারটি স্তম্ভের ধারণা দেন–স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ। এ স্তম্ভগুলোর ওপর ভর করেই আমরা অর্জন করতে পারি কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা তাঁর এই রূপরেখার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের শুধু রাস্তাই দেখিয়ে দেননি বরং চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আমাদের সাহসও জুগিয়েছেন।

স্মার্ট নাগরিক

বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিকই স্মার্ট নাগরিক। দেশের জনগণকে স্মার্ট

নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. ডিজিটাল দক্ষতার সূচক ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ, ২০৩১ সালের মধ্যে ৭৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশের অধিক উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে;
২. স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ, ২০৩১ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা;
৩. ২০৪১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্মার্ট আইডির সর্বজনীন ব্যবহার শতভাগে উন্নীত করা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৪. ২০২৫ সালের মধ্যে ই-পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবা তৈরিতে সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে নাগরিক ও সরকার সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা।

স্মার্ট অর্থনীতি

ক্যাশলেস, উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিই হবে স্মার্ট অর্থনীতি। দেশের অর্থনীতিকে স্মার্ট হিসাবে গড়ে তুলতে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. ২০২৫ সালের মধ্যে ক্যাশলেস লেনদেন ৩০ শতাংশের বেশি এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা। এছাড়াও ২০৪১ সালের মধ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার এবং দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোঠায় আনা।
২. ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপিতে প্রায় ১ শতাংশ TFP (Total Factor Productivity) প্রবৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপিতে ২.৫ শতাংশ TFP প্রবৃদ্ধি এবং CMSME (Cottage, Micro, Small and Medium Enterprise)-সহ সব বেসরকারি খাতের ডিজিটাইজেশন নিশ্চিত করা।
৩. স্মার্ট অর্থনীতির সূচক টেকনোলজির সক্ষমতার আওতায় ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিকে প্রাধান্য দিয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সের উন্নয়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ব্যাবসা সহজ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
৪. ২০২৫ সালের মধ্যে ৫টি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫টি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০টি ইউনিকর্ন স্টার্ট-আপ স্থাপন।
৫. ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চগতি ও নির্ভরশীল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার ৭০ শতাংশের বেশি এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা।

স্মার্ট সরকার

নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক, কাগজবিহীন, উপাত্তনির্ভর, আন্তসংযুক্ত আন্তচালিত, সমন্বিত, স্বয়ংক্রিয় সরকারব্যবস্থাই স্মার্ট সরকার হিসাবে বিবেচিত হবে। স্মার্ট সরকার বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

১. ২০২৫ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ স্টেকের মাধ্যমে ৩০ শতাংশের বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা সহজলভ্য এবং আন্তচলমান করা।
২. ২০২৫ সালের মধ্যে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য স্মার্ট ড্যাশবোর্ড তৈরি, ২০৩১ সালের মধ্যে আন্তপরিচালিত ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিনির্ভর ড্যাশবোর্ড এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও এআই-নির্ভর করা।
৩. ইউএন ই-গভ ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সাল নাগাদ একশর মধ্যে, ২০৩১ সাল নাগাদ সত্তরের মধ্যে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ পঞ্চাশের মধ্যে আনয়ন।
৪. প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের মধ্যে ১২ শতাংশের বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৭ শতাংশের বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২২ শতাংশের বেশি নির্ধারণ করা।

স্মার্ট সমাজ

বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, সহনশীল, নিরাপদ এবং টেকসই সমাজব্যবস্থাই স্মার্ট সমাজব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হবে। স্মার্ট সমাজব্যবস্থার কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

১. ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশের অধিক এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তিচাহিদা অনুযায়ী (Personalised) সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।
২. গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম ৩০টি দেশের মধ্যে, ২০৩১ সালের মধ্যে প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
৩. স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম–এই সূচকে ২০২৫ সালের মধ্যে 'ডিজিটালি নেটিভ' হওয়া, ২০৩১ সালের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও এআই-নির্ভর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
৪. ২০২৫ সালের মধ্যে সমাজব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, যেখানে সব বয়স, ধর্ম, শারীরিক সক্ষমতা ও শ্রেণি-পেশার মানুষ ডিজিটাল অ্যাকসেস সুবিধাসম্পন্ন এবং গ্লোবাল ইকুয়ালিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ। এছাড়াও ২০৩১ সালের মধ্যে বয়স, ধর্ম, বর্ণ, শারীরিক সক্ষমতা–নির্বিশেষে সবার সহাবস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে ডিজিটালভাবে সহনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সরকারি কর্মকাণ্ডে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা।

উপরে আলোচিত এ স্তম্ভগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি একটি স্মার্ট বাংলাদেশ। ছোটো ছোটো কিছু পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই গড়ে তুলতে হবে একেকটি স্তম্ভ। এ স্তম্ভগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া যেতে পারে:

স্মার্ট আইডি

স্মার্ট বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকেরই একটি করে স্মার্ট আইডি থাকবে। এ আইডির বিপরীতে তার সব তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন সংস্থা এ তথ্য-উপাত্ত কতটুকু ব্যবহার করতে পারবে, সে বিষয়ে একটি নীতিমালা থাকা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে দেখা যায়, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে

বর্তমানে আইটি সেবা রপ্তানি খাতে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের আইটি খাতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে এ খাতে রপ্তানি এবং আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের যথাযথ নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যাতে আমদানির ক্ষেত্রে আমরা কোনো বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হই। এর পাশাপাশি আমাদের রপ্তানি সুরক্ষিত করার জন্য এবং এসব রপ্তানি খাতে নিয়োজিত জনবলকে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

এবং নিজেদের মতো ব্যবহার করতে থাকে। এতে নাগরিকের তথ্য নানাভাবে অপব্যবহৃত হয়। স্মার্ট আইডি প্রণয়নের সময় এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ আইডির তথ্যগুলো ব্যবহার করার জন্য একটি এপিআই থাকবে এবং কোন সংস্থা কতটুকু তথ্য ব্যবহার করতে পারবে, সে বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকতে হবে। জনগণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। এ আইন যেন বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা জনগণের তথ্য ব্যবহারকে সংযত করতে পারে, এ বিষয়ে জোর দিতে হবে।

ক্যাশলেস পেমেন্ট

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে ক্যাশলেস বাংলাদেশ। কাগজের মুদ্রার পরিবর্তে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করা হবে। ক্যাশলেস বাংলাদেশ করার ক্ষেত্রে স্মার্ট আইডি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই একই আইডির মাধ্যমে যেন আমরা দেশের সব সেবা নিতে পারি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে। স্মার্ট আইডির সঙ্গে পেমেন্ট ব্যবস্থা সংযুক্ত করতে হবে; যেন এ আইডি দিয়েই আমরা সব ধরনের লেনদেন করতে পারি।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে আমাদেরকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিকে ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ে কিছু কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। যেমন: ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর রোবোটিকস, জাতীয় ব্লকচেইন স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশ, স্ট্র্যাটেজি টু প্রমোট মাইক্রোপ্রসেসর ক্যাপাসিটি ইন বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ইন্টারনেট অব থিং স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশ এবং ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশ। এতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির প্রাথমিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু আমরা এ প্রযুক্তিকে ব্যাবহারিক কাজের আওতায় নিয়ে আসছি, সেহেতু এ বিষয়ক যথাযথ আইন, বিধি বা নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে এদিকগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। এতে আমরা কারিগরি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা নিতে পারি এবং পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক করতে পারি। এতে আমরা আমাদের জনবলকেও এসব আইনের আওতায় যথাযথভাবে দক্ষ করে তুলতে পারব।

আইটি বিশেষজ্ঞ ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবল

ইতোমধ্যে আমরা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছি। ২০২৯ সালের দিকে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের সুযোগ-সুবিধাগুলো আর পাব না। তাই আমাদের আইটি ক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষ হওয়া প্রয়োজন যাতে আমরা আমাদের উৎপাদনব্যবস্থাকে আরও উৎপাদনমুখী এবং কার্যকরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। বর্তমানে আমাদের আইটি ক্ষেত্রে প্রধান আয়ের ক্ষেত্র ফ্রিল্যান্সিং। আমাদের ফ্রিল্যান্সিং ছাড়াও অন্যান্য প্রযুক্তিগত রপ্তানির দিকে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। তাই ফ্রিল্যান্সিং-এর পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্র আমাদের অনুধাবন করতে হবে। বর্তমানে আইটি সেবা রপ্তানি খাতে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের আইটি খাতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে এ খাতে রপ্তানি এবং আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের যথাযথ নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যাতে আমদানির ক্ষেত্রে আমরা কোনো বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হই। এর পাশাপাশি আমাদের রপ্তানি সুরক্ষিত করার জন্য এবং এসব রপ্তানি খাতে নিয়োজিত জনবলকে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যের দ্বৈততা পরিহার

সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থায় যেসব সফটওয়্যার তৈরি করা হয়, সেক্ষেত্রে দেখা যায়, একই কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তর-সংস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে যেমন সফটওয়্যার বা ডেটা ও উপাত্তের দ্বৈততা তৈরি হয়, তেমনই অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। এসব দ্বৈততা পরিহারের জন্য ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। এতে বলা হয়, সব জাতীয় সেবা ও তথ্যের মধ্যে আন্তসংযোগ স্থাপন করতে হবে। জাতীয় নাগরিক সেবাগুলোর সমন্বয়ের একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। সব সরকারি সেবার মধ্যে আন্তপরিবাহিতা (Interoperability) নিশ্চিত করতে হবে। একই তথ্য যেন একাধিকবার প্রবেশ করতে না হয় এবং পুনর্ব্যবহার করা যায়, সে ব্যবস্থা করা। এভাবে সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস করা। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা ২০১৯ এর নির্দেশনা অনুসরণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নেওয়া সেবা সহজীকরণের আওতায় প্রকল্পগুলোয় যখন

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হয়, সেসময় সফটওয়্যার বা সোর্স কোডের মালিকানাবিষয়ক কোনো চুক্তি থাকে না। যেহেতু সফটওয়্যারগুলো প্রকল্পের অংশ হিসাবে উন্নয়ন করা হয়, সেহেতু প্রকল্পের বা সফটওয়্যারের মালিকানা ওই প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা উচিত। ওই প্রতিষ্ঠানের আইটি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযোগী জ্ঞান থাকা উচিত। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রকল্প বা সফটওয়্যার উন্নয়ন সম্পন্নের পর শুধু সফটওয়্যারের ব্যবহারযোগ্য ইন্টারসেফটি ওই প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাজেটে মেইনটেন্যান্স এবং পরবর্তী সময়ে আপডেটের বিষয়ে উল্লেখ থাকে না। সেক্ষেত্রে সেই সফটওয়্যারটির উন্নয়নের চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে আর মেইনটেন্যান্স বা আপগ্রেডেশন করা সম্ভব হয় না। ফলে একসময় সফটওয়্যারটির ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না এবং এর মাধ্যমে ব্যবহৃত ডেটাগুলো পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। সফটওয়্যার পরিবর্তনশীল। কিছু সময় পরপর এর মেইনটেন্যান্স বা কোনো ফিচারের আপডেট করার বা নতুন কোনো ফিচার যুক্ত করার প্রয়োজন হয়। তাই সফটওয়্যারগুলোর মালিকানা, সোর্স কোডের ব্যবস্থাপনা এবং সেগুলোকে পরবর্তী সময়ে পুনরায় আপডেট করার সক্ষমতা ওই প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই থাকা উচিত। সফটওয়্যার উন্নয়নের চুক্তি করার সময় এ ব্যাপারে নজর রাখতে হবে। চুক্তিতে এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রকল্পগুলোর আওতায় উন্নয়নকৃত/বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের বাস্তবায়নের পর্যায়ে দপ্তর-সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওই সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের জন্য অবহিত করা হয়। কিন্তু সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের কারিগরি বিষয়ে বুঝে নেওয়ার মতো কারিগরি দক্ষতা বা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ওই প্রতিষ্ঠানে না থাকায় ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা নানাভাবে অসুবিধা বা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এতে এসব প্রকল্পের মাধ্যমে যে সেবাগুলো উন্নয়ন করা হয়, জনগণ তার সুবিধা পুরোপুরি লাভ করতে পারে না। এ সমস্যার সমাধানে সরকারের যেসব অঙ্গসংস্থা কারিগরি বিষয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে আসছে, তাদের দায়িত্বে এসব দপ্তর-সংস্থার জনবলকে কারিগরি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান প্রদান করা যেতে পারে। এতে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে জ্ঞান ও সহযোগিতার সংযোগ স্থাপন হবে, যা ভবিষ্যতে সরকারকে একটি সামগ্রিক সিস্টেম হিসাবে রূপান্তরে ভূমিকা রাখবে। স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম স্তম্ভ স্মার্ট সরকারের একটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে একক সত্তা হিসাবে সরকারকে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা।

টেকসই ও উৎপাদনমুখী শিল্প

উদ্ভাবনমুখী হওয়ার জন্য আমাদের টেকসই শিল্পের দিকে ঝুঁকতে হবে। বর্তমানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মোবাইল, গাড়ি ও কিছু অন্যান্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করলেও তারা মূলত বাইরে থেকে পার্টস আমদানি করে সেগুলো অ্যাসেম্বল করে। এক্ষেত্রে আমরা যেন নিজেরাই বিভিন্ন পার্টস তৈরি করতে পারি, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমানে দেশে নতুন করে অনেক অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে।

গবেষণায় বিনিয়োগ

আমাদের গবেষণামুখী হতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকেও গবেষণামুখী করে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি এসব ক্ষেত্রে বেসরকারি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে দেখা যায়, বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের নিজেদের কোনো গবেষণা ও উদ্ভাবনকেন্দ্র নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উদ্ভাবনবিষয়ক কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। গবেষক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেন সরাসরি গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অর্থলগ্নি করতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোনো গবেষণা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সেই গবেষণার যেন প্রায়োগিক বাস্তবায়ন করা যায়, এজন্য অন্তত গবেষণাটি পাইলটিং পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কাজে সমন্বয়সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যুক্ত হতে পারে।

স্মার্ট বিচারব্যবস্থা

ই-জুডিশিয়ারি নিয়ে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কাজ চলমান রয়েছে। জুডিশিয়ারি ডিজিটাল করার লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি সেকশন কাজ শুরু করেছে। জুডিশিয়ারি সিস্টেম ডিজিটাইজ করার ফলে কয়েকটি সুবিধা পাওয়া সম্ভব। যেমন:

১. দীর্ঘ সময় ধরে অনিষ্পন্ন মামলার পরিমাণ কমানো;
২. বিচারব্যবস্থাকে দ্রুত ও সহজীকরণ করা;
৩. সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;
৪. বিদ্যমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
৫ মামলায় ব্যবহৃত ডিজিটালি পরিবর্তনযোগ্য কাগজের পরিমাণ কমানো;
৬. মামলা সহজীকরণ।

বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে ডিজিটাইজ করা এবং 4IR টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে স্মার্ট ও জনবান্ধব করা সম্ভব। ইতঃপূর্বে করোনাকালীন ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে অনেক মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফৌজদারি মামলাগুলো দ্রুত সময়ে নিষ্পন্ন করার জন্য ভার্চুয়াল কোর্টের ধারণাকে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ভার্চুয়াল কোর্ট কিংবা অনলাইন হিয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা দেশের বাইরে অবস্থানকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা সম্ভব। তাছাড়া ডিজিটাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে দেশের বাইরে পলায়নকারী আসামিদেরও আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্তম্ভগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আইনগুলোর সংস্কার ও এর প্রয়োগ। তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিকের সাংবিধানিক সব অধিকার যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকের সুবিধার জন্য এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনে আইন সংস্কার বা নতুন আইন করা যেতে পারে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা অতীব জরুরি। এক্ষেত্রে সব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় থাকা দরকার। এ সমন্বয়সাধনে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা-২০১৯ এ উল্লিখিত কারিগরি টিমকে সক্রিয় করা যেতে পারে। এ টিম প্রচলিত সব আইন মেনে দেশের সব সেবা ডিজিটাইজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ধারণা দেবে।

লেখক: পরিচালক (গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাইবার নিরাপত্তা

এস. এম. আশরাফুজ্জামান

বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না। ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হবে জাতীয় উন্নয়নের 'Misson' ও 'Vision'। তিনি ১০০ বছরের ডেল্টা প্ল্যান গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্বপ্নের সেই স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে চারটি স্তম্ভ নিয়ে: (১) স্মার্ট নাগরিক, (২) স্মার্ট সরকার, (৩) স্মার্ট সোসাইটি এবং (৪) স্মার্ট ইকোনমি। স্বয়ংক্রিয় থাকবে প্রযুক্তি ও যোগাযোগব্যবস্থা। টেকসই নগরায়ণসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সব সেবা থাকবে হাতের নাগালে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। প্রতিষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

বিজ্ঞান গতি ও বেগ দেয়। কিন্তু কেড়ে নেয় আবেগ। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ? এ নিয়ে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বিতর্কের বিষয়বস্তু থাকত। সত্যিই তাই–'বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার চুরি' আমাদের সুযোগ ও দূরদর্শিতার চোখ খুলে দিয়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে ওঠার সঙ্গে বাড়বে প্রযুক্তিভিত্তিক বিপত্তি। এসব বিপত্তি দূরীকরণে প্রয়োজন হবে স্মার্ট নাগরিকের। এ লক্ষ্যে সরকার 'স্মার্ট জননিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং নিরাপদ ক্লাউড' বিষয়ক উপকমিটি গঠন করেছে। এ কমিটি স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ত্রুটি

দূরীকরণ এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ভঙ্গুরতার সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

সাইবার আক্রমণ এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল ও সাইবার নিরাপত্তা বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। মহান সৃষ্টির মধ্যেও কালো অধ্যায় থাকে। কিছু দুষ্টচক্র সব সময়ই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে আসছে। এটিকে সুরক্ষা দেওয়ার নামই সাইবার নিরাপত্তা। বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী নিরলসভাবে সাইবার নিরাপত্তা দিয়ে আসছে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাইবার বিশেষজ্ঞ নিরাপত্তাকর্মী তৈরি করছে। বর্তমানে যেসব সাইবার অপরাধ হয়ে থাকে এবং এর সুরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশবাহিনী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

বিশ্বায়নের যুগে অন্যতম পরিচিত শব্দবন্ধটি হলো সাইবার সিকিউরিটি বা সাইবার নিরাপত্তা। এটি আমাদের ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করে। সাম্প্রতিক সময়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা স্বয়ংক্রিয় বুদ্ধিমত্তানামক এমন এক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা শুধু তথ্যপ্রযুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা নয়, এটি আধুনিক বিশ্বকেই পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। আবার এআই-এর অপব্যবহারের কারণে সাইবার সিকিউরিটি আরও বেশি হুমকির মুখে পড়েছে। অনেক নারীর ডিপফেক ও নগ্ন ইমেজ তৈরি করা হচ্ছে এআই-এর মাধ্যমে। শিশু, তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে পর্নোগ্রাফি বর্তমানে অন্যতম সামাজিক ব্যাধি। একটা অসাধু চক্র ও বিকৃত রুচির মানুষ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। অল্প বয়সি তরুণ-তরুণীরা না বুঝে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সাইবার নিরাপত্তা বলতে কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, প্রোগ্রাম এবং ডেটাকে অননুমোদিত প্রবেশ, ক্ষতি, চুরি এবং অন্য ধরনের সাইবার হুমকি থেকে রক্ষা করার অনুশীলনকে বোঝায়। প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল সিস্টেমের ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাইবার হুমকি ম্যালওয়্যার, র‍্যানসমওয়্যার, ফিশিং আক্রমণ, হ্যাকিংয়ের প্রচেষ্টা, ডেটা লঙ্ঘন, পরিচয় চুরি-সহ বিভিন্ন আকারে বা বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ হুমকিগুলোর গুরুতর পরিণতি হতে পারে সরকারের আর্থিক খাত এবং ব্যক্তি সুনামের ক্ষতি, প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো ব্যাহত করা, এমনকি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করা পর্যন্ত হতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তার একটি মৌলিক দিক হলো তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা। গোপনীয়তা অননুমোদিত অ্যাকসেস থেকে সেনসেটিভ ডেটা সুরক্ষা বোঝায়। এর মধ্যে ট্রান্সমিশন এবং স্টোরেজের সময় ডেটা সুরক্ষিত করার জন্য এনক্রিপশন কৌশলগুলো নিয়োগ করা, অনুমোদিত ব্যক্তিদের কাছে তথ্য সীমাবদ্ধ করার জন্য অ্যাকসেস নিয়ন্ত্রণ করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ডেটা এবং সিস্টেমের Fluency বজায় রাখা। যাতে তথ্য সঠিক, সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তিত থাকে। এতে ডেটা ব্যাকআপ, সুরক্ষিত কোডিং অনুশীলন বাস্তবায়ন, নিয়মিত আপডেট এবং প্যাচিং সফটওয়্যার এবং অননুমোদিত পরিবর্তনগুলো শনাক্ত ও প্রতিরোধ করতে অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ সিস্টেম ব্যবহার করার মতো ব্যবস্থা জড়িত।

সাইবার নিরাপত্তায় সচেতনতার বিকল্প নেই। একটি ক্লিকই হতে পারে মহাবিপদের কারণ। 'সাইবার নিরাপত্তা' বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সাইবার নিরাপত্তা বলতে মূলত বোঝায় কিছু সচেতনতা, কিছু উপায়; যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য, কম্পিউটার, বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ডিভাইসকে হ্যাকিং ও বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে পারি। আমরা এখন পুরোপুরি নেটওয়ার্কবেষ্টিত একটি পরিবেশে থাকি। সাইবার নিরাপত্তা হলো সব ধরনের সাইবার তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ডিভাইসের নিরাপদ ব্যবহার, তথ্য চুরির হাত থেকে রক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যার থেকে নিরাপদ থাকা। একটি মাউস ক্লিক সুগম করে দিতে পারে শক্তিশালী একটি ম্যালওয়্যারের আগমন। সাইবার নিরাপত্তার হুমকিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে এ জগতে নিরাপদ থাকা সহজ হবে।

সাইবার নিরাপত্তায় হুমকিগুলো

সাইবার জগতের সবচেয়ে বড়ো হুমকি ধরা হয় বিভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যারকে। জানতে হবে ম্যালওয়্যার কী, কত ধরনের হতে পারে, কী দেখে ম্যালওয়্যার চেনা যাবে:

১. **অ্যাডওয়্যার:** অ্যাডওয়্যারকে সবচেয়ে কম ক্ষতিপূর্ণ ম্যালওয়্যার ধরা হয়। অ্যাডওয়্যার মূলত আপনাকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখাবে। ভালো না জেনে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল কিংবা ব্রাউজার প্লাগইন ইনস্টল করার মাধ্যমে অ্যাডওয়্যার ঢুকে পড়বে আপনার সিস্টেমে। তাই ট্রাস্টেড সোর্স ছাড়া সফটওয়্যার ও ব্রাউজার প্লাগইন ইনস্টল কখনোই ঠিক নয়।

২. **ভাইরাস:** ভাইরাস একধরনের প্রোগ্রাম, যা সাধারণত অন্য একটি সফটওয়্যারের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তী সময়ে পুরো সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাস বেশির ভাগ সময় সফটওয়্যার অথবা ফাইল শেয়ারিং-এর মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে। হোস্টিং অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে ভাইরাসযুক্ত ফাইল কখনোই আপনার অ্যাকাউন্টে আপলোড করবেন না।

৩. **র‍্যানসমওয়্যার:** র‍্যানসমওয়্যার আপনার সিস্টেম লক করে দেবে এবং আনলক কোডের জন্য টাকা চাইবে। (বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত)

৪. **ব্যাকডোর:** ব্যাকডোর এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একজন হ্যাকার কিংবা স্প্যামার আপনার নেটওয়ার্ক সংযোগ ব্যবহার করতে পারবে।

৫. **কি লগার:** কি লগারের কাজ হলো কম্পিউটারে যা-ই টাইপ করা হবে, ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড অথবা যে কোনো স্পর্শকাতর তথ্য–সবকিছু রেকর্ড করবে এবং পরবর্তী সময়ে কি লগারের প্রোগ্রামারকে সব তথ্য পাঠিয়ে দেবে।

৬. **রুট কিট:** এটি ভয়ানক ধরনের ম্যালওয়্যার। সহজে এটা ধরা যায় না। রুট কিট অন্য ম্যালওয়্যারকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

৭. **স্পাইওয়্যার:** স্পাইওয়্যার মূলত আপনাকে স্পাই করবে। আপনার ইন্টারনেট অ্যাকটিভিটিস থেকে শুরু করে সবকিছু।

৮. **ট্রোজান হর্স:** ট্রোজান এই সময়ের সবচেয়ে ভয়ংকর ম্যালওয়্যার। এটা আপনার আর্থিক তথ্য চুরি করবে। আপনার সিস্টেমের রিসোর্স ব্যবহার করবে। ট্রোজান বড়ো কোনো সিস্টেমকেও ডাউন করে দিতে সক্ষম।

৯. **ওর্ম:** ওর্ম একধরনের খাদক। ওর্মের খাবার হলো আপনার প্রয়োজনীয় ফাইল। একটি ড্রাইভে যখন ওর্ম ঢুকে পড়বে, এটি ধীরে ধীরে ড্রাইভটি খালি করে ছাড়বে।

১০. **আইডেন্টিটি থিভস/ফিশিং:** অনেক সময় চমকপ্রদ অফার দিয়ে ইমেইল আসে আমাদের ব্যক্তিগত ইমেইল অ্যাকাউন্টে। ব্যাংক, পরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠান, বন্ধুর নাম দেখেই আমরা মেইল খুলে

বসি, ক্লিক দিয়ে দিই। ফিশিং ইমেইলগুলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে। অপরিচিত/সন্দেহজনক ইমেইল ওপেন করা ঝুঁকিপূর্ণ।

নাল্ড (ক্রেকড) ভার্সনের ঝুঁকি

ফ্রি থিম, ফ্রি সিএমএস প্লাগইন কিংবা প্রিমিয়াম থিমের নাল্ড (ক্রেকড) ভার্সন পেলেই ব্যবহার করা উচিত নয়। একজন হ্যাকার নাল্ড (ক্রেকড) ভার্সনে নিজের কোনো লুকানো শেল স্ক্রিপ্ট অথবা এমন কিছু ব্যাকডোর-জাতীয় ম্যালওয়্যার নাল্ড (ক্রেকড) ভার্সনের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে, যা দিয়ে সে পরবর্তী সময়ে যেখানে এ সফটওয়্যার/থিম/প্লাগইন ইনস্টল থাকবে, সে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে। আপনার ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার, কম্পিউটার, হোস্টিং অ্যাকাউন্ট তখন হ্যাকার ব্যবহার করবে তার ইচ্ছামতো আপনার অজান্তে।

বট নেট অ্যাটাক, স্প্যাম, হ্যাকিং (অন্য কোনো নেটওয়ার্ক), এছাড়া ভয়ানক অনেক কিছুতেই ব্যবহার হতে পারে আপনার সিস্টেম/নেটওয়ার্ক/হোস্টিং অ্যাকাউন্ট। যার দায়ভার আপনাকেই নিতে হতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তায় ১০টি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়

১. আপনার অপারেটিং সিস্টেম আপ-টু-ডেট রাখুন।
২. অবশ্যই অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে। কখনোই ক্র্যাক ভার্সন ব্যবহার করবেন না। আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে ফ্রি ট্রায়াল ব্যবহার করুন। (পরিচিত কোম্পানিগুলোর মাঝে পরিবর্তন করে করে ব্যবহার করতে পারেন)
৩. আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য অবশ্যই ব্যাকআপ রাখুন।
৪. ব্যক্তিগত তথ্য নেটওয়ার্ক সংযুক্ত যন্ত্রে না রাখাই ভালো।
৫. ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকিং-সহ সব আর্থিক তথ্য কোথাও ইনপুট দেওয়ার আগে কয়েকবার চেক করে নিন কোন ওয়েবসাইটে দিচ্ছেন। পারসোনাল ফায়ার ওয়াল থাকলে ভালো এক্ষেত্রে।
৬. যে কোনো ধরনের অ্যাড/বিজ্ঞাপনে ক্লিক দিবেন না।
৭. অপরিচিত ইমেইল খুলবেন না। শুধু ইমেইল ওপেন করার কারণেই আপনার তথ্য চলে যেতে পারে হ্যাকারের কাছে।
৮. পাসওয়ার্ড ব্রাউজারে অটো সেভ করে না রাখাই ভালো।
৯. ফাইল ফরম্যাট দেখেই ভাববেন না ওপেন করার কথা। যেমন: একটি পিডিএফ ফাইল ওপেন করলেও আপনার অজান্তে নেটওয়ার্কে ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে যেতে পারে।
১০. সব শেষে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সচেতন হতে হবে বেশি। অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মীয় অথবা মানবিক আবেগকে পুঁজি করে জঙ্গি অথবা চরমপন্থি গোষ্ঠী আপনাকে ব্যবহার করছে আপনার অজান্তে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে এই চমকপ্রদ তথ্য।

শুধু ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আপনাকে সাইবারজগতে নিরাপদ রাখতে যথেষ্ট নয়। নিরাপদ থাকতে হলে তিনটি স্টেপ জরুরি–স্টপ, থিংক ও কানেক্ট। একটু থামুন, কী করতে যাচ্ছেন? একটু ভাবুন, এরপর যা করবেন, তার ওপর নির্ভর করছে আপনার সাইবার নিরাপত্তা।

লেখক: অতিরিক্ত ডিআইজি, সাইবার নিরাপত্তা, তদন্ত ও মনিটরিং (সিপিসি), সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

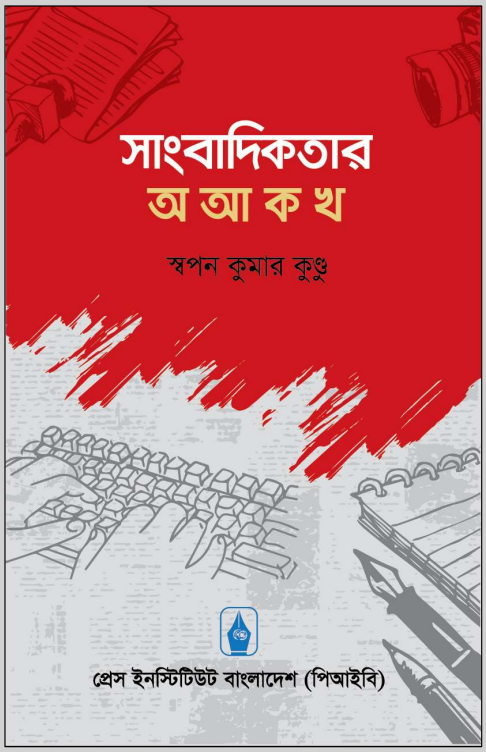

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি

ইঞ্জিনিয়ার রিংকো কবিরাজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ: ভিশন-২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন-পরবর্তী উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, বহুজাতিক কোম্পানিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থাও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করাই এর মূল লক্ষ্য। দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে রূপকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে অর্থনীতিতে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, সেই গতিশীলতাকে ধরে রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনীমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন মানবিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ–স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন: স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট পুলিশিং, স্মার্ট ট্যুরিজম, স্মার্ট শিল্পোন্নয়ন, স্মার্ট কর্মসংস্থান, স্মার্ট পরিবহণ,

স্মার্ট বিচারব্যবস্থা ও স্মার্ট সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

স্মার্ট কৃষি

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ এবং কৃষিতে আমাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। সাধারণ কৃষিকে স্মার্ট কৃষিতে পরিণত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যতম এবং এটি ব্যবহারের জন্য কৃষি একটি উজ্জ্বল ক্ষেত্র। ইতোমধ্যে কৃষিতে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, ভারত-সহ বিভিন্ন উন্নত দেশ ব্যাপকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার শুরু করেছে এবং উৎপাদনকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। জমি রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে কৃষির মোটামুটি সব ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব সহজে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে লেন্স জুম ব্যবহার করে মেশিনকে আকার ও টেক্সচার সম্পর্কিত ধারণা দেওয়া যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংবলিত প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, আগাছার উপস্থিতি, আগাম ফসল ব্যবস্থাপনা, ফুল-ফলের সময়, ফসলের সম্ভাব্য পরিমাণ প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়। সার ও বালাই ব্যবস্থাপনাও খুব সহজেই করা যায়। ক্রপ মডেলিং, প্রিসিসন অ্যাগ্রিকালচার এখন ব্যাপক পরিচিত, যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষিতে দিনে কয়েক হাজার বীজ বপন করে চারা স্থানান্তরিত করা খুবই সাধারণ ঘটনা। স্যাটেলাইট দিয়ে ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে ইমেজিং করে জমির ফার্টিলিটি নির্ণয় করে সার ও বীজ প্রয়োগ এবং বপন করা যায়। একইভাবে সেন্সর ডিভাইস কাজে লাগিয়ে জমিতে চাহিদা অনুপাতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। এতে একদিকে যেমন পানির অপচয় রোধ হয়, অন্যদিকে সঠিক সময়ে সেচের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়। ফসলের মাঠের আর্দ্রতা পরিমাপ, ফসলে উপাদানের উপস্থিতি নির্ধারণ, শস্য রোপণ ডিজাইন, বীজ বপন, ইমেজ প্রযুক্তির মাধ্যমে পোকার আক্রমণ জানা, কীটনাশক স্প্রে, সেচ মনিটরিং, ফসলের উৎপাদন জানা, ফসলের সার্বিক মনিটরিং করা, মাটির নিউট্রেন্ট, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, পিএইচ, লবণাক্ততা, ফসলের নিউট্রেন্টের অভাব, ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের উপস্থিতি জানা, কৃষি সহনশীল ওয়েদার ফোরকাস্টিং এবং আগাম অ্যালার্মিং দেওয়া, ফসলের সম্ভাব্য ফলনের পূর্বাভাস দেওয়া, কৃষি কল সেন্টার সেবা দেওয়া, সর্বোপরি কৃষিপণ্যের বাজারদর জানা যাবে। আগামী দিনে কৃষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এ খাতে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত প্রযুক্তিভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকারের অন্যতম। দেশে মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন নারীরা। গর্ভাবস্থায় ও প্রসবোত্তর চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা কমিয়ে স্বাস্থ্যসেবা আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। রোগীর মেডিক্যাল ডেটা এবং মেডিসিন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলোকে বিশ্লেষণ করে আরও নির্ভুলভাবে তথ্য উপস্থাপনের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল তৈরিতে কাজ করা হচ্ছে। ক্লিনিক্যাল ডিসিশন সাপোর্ট টুলস প্রদানকারীদের রোগীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য বা গবেষণায় দ্রুত অ্যাকসেস প্রদান করে চিকিৎসা, ওষুধ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং রোগীর অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। মেডিক্যাল ইমেজিং, এআই সরঞ্জামগুলো সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, এমআরআই এবং ক্ষত বা অন্য ফলাফলগুলোর জন্য অন্যান্য চিত্র নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। রোগ শনাক্তকরণ ও নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মেশিন লার্নিং মডেলগুলো ব্যবহার করে রোগীর শারীরিক বিভিন্ন লক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হলে চিকিৎসককে সতর্ক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এই অ্যাপ্লিকেশন। এক্ষেত্রে হার্ট মনিটরের মতো মেডিক্যাল ডিভাইসগুলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো ট্র্যাক করা, এআই সেই ডিভাইসগুলো থেকে ডেটা সংগ্রহ করা এবং সেপসিসের মতো আরও জটিল অবস্থার সন্ধান করতে পারে। এআই চ্যাটবটগুলোর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা সহায়তা করতে পারে। কোভিডের মতো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মহামারি বিস্তার নির্ধারণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা যেখানে সহজলভ্য নয়, তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে। মেশিন লার্নিং কৌশল স্বাস্থ্যসেবা রেকর্ড, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করতে পারে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং অপারেশনগুলোকে অপটিমাইজ করতে পারে।

স্মার্ট পুলিশিং

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংবলিত স্মার্ট পুলিশিং অপরাধের ঘটনাস্থল এবং অপরাধী দ্রুত চিহ্নিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পুলিশিং ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের বড়ো সুবিধা হলো প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস। সুবিস্তর তথ্যভান্ডারের স্বয়ংক্রিয় পর্যালোচনার মাধ্যমে এআই অ্যালগরিদম এমন কিছু ঘটনা ও অপরাধের লক্ষণ শনাক্ত করতে সক্ষম, যা সাধারণ মানুষের পর্যালোচনা শক্তি দ্বারা অসম্ভব। এ পূর্ব শনাক্তকরণ সক্ষমতা পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা দমনে সাহায্য করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তি সন্দেহভাজন অপরাধীকে চিহ্নিত করতে এবং তার গতিবিধি লক্ষ করতে সক্ষম। একই সঙ্গে এ প্রযুক্তি নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান, আত্মগোপনে থাকা অপরাধীকে খুঁজে বের করা এবং জনসমাগমে মানুষের নিরাপত্তায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিরাপদ ও উন্নত শহর বাস্তবায়নে স্মার্ট পুলিশিংয়ের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিংসহ শহরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়, গতিশীল, নির্ভুল, নিরাপদ ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী নানা পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া ডেটা ড্রিভেন পর্যালোচনার মাধ্যমে এআই প্রদত্ত ভবিষ্যৎমুখী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অপরাধপ্রবণতা কমে আসবে; যা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরাপদ সমাজব্যবস্থার দিকে আমাদের নিয়ে যাবে।

স্মার্ট ট্যুরিজম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দেশের কৃষ্টি-কালচার, পরিবেশ-প্রকৃতিসহ দর্শনীয় স্থানগুলোকে দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে পরিচিত করা স্মার্ট ট্যুরিজমের প্রধান উদ্দেশ্য। স্মার্ট ট্যুরিজমের জন্য ব্যবহৃত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইন্টারনেট অব থিংকস, মোবাইল যোগাযোগ, ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অ্যাগমেন্টেড রিয়েলিটি ও কিউআর কোড। পৃথিবীর অন্যতম স্মার্ট পর্যটন নগরী ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি ইউরোপিয়ান পর্যটকদের পাশাপাশি নর্থ আমেরিকান পর্যটকদের আকর্ষণে স্মার্ট ট্যুরিজমের অন্যতম উপাদান ইন্টারনেট অব থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-নির্ভর রোবট সার্ভিস চালু করেছে। ডিজিটাল মার্কেটিং-এর টুলসগুলোর

মধ্যে ই-মেইল মার্কেটিং, তথ্য সংবলিত নান্দনিক ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এবং কনটেন্ট মার্কেটিং অন্যতম। টেকসই পর্যটন উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থানীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে টেকসই পর্যটন বিকাশ প্রয়োজন। স্মার্ট ট্যুরিজমের মাধ্যমে তৈরি হবে স্কিল বেজড জব, বাড়বে বিদেশি পর্যটক, অর্জিত হবে বৈদেশিক মুদ্রা, পর্যটন খাতে বাড়বে ফ্রিল্যান্সার এবং তৈরি হবে স্মার্ট অর্থনীতি; যা উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবে।

স্মার্ট শিক্ষা

স্মার্ট জাতি গঠনে প্রয়োজন স্মার্ট শিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দক্ষতার উন্নতির মাধ্যমে একইভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য বাড়তি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে শুধু সময়ই বাঁচবে না, শিক্ষার্থীরা দ্রুততম সময়ে তাদের ফলাফল পেয়ে যাবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সাধারণত অ্যালগরিদম ও মেশিন লার্নিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিশাল তথ্যভান্ডার বিশ্লেষণ করে ফলাফল ও অনুমান জানিয়ে থাকে। লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে স্কুল ইন ক্লাউড, কমিউনিটি স্কুল ইন ক্লাউড এবং রিজিওনাল স্কুল ইন ক্লাউডে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারলে দেশের সব শিক্ষাব্যবস্থা স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় চলে আসবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যও বাড়তি সহায়ক হতে পারে। যেহেতু এর অ্যালগরিদম শিক্ষার্থীর দক্ষতা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দিতে পারে, তাই এটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে সহায়ক হতে পারে। প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ভাবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

স্মার্ট কর্মসংস্থান

বেকার সমস্যা সমাধানে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সার তৈরি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর দক্ষ যুব, শারীরিকভাবে অক্ষম ও বেকার যুবকদের জন্য স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের মেধাবীদের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লক চেইন, রোবোটিকস, বিগ ডেটা, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, সাইবার নিরাপত্তার মতো উন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে সরকার। সরকারের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচটি ইউনিকর্ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০টি ইউনিকর্ন স্টার্ট-আপ তৈরিতে সহায়তা করা, যেখানে প্রতিটি ইউনিকর্ন স্টার্ট-আপ লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

স্মার্ট শিল্পোন্নয়ন

সরকার এ পর্যন্ত আটটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রতিবছর বার্ষিক বাজেটে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নানা সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে আসছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রভৃতির ফলে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি ভোক্তা বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এআই হলো পণ্যের চলাচল এবং স্টোরেজ, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, অ্যাডভান্স অ্যানালিটিকস ও ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে অটোমেশন এবং রোবোটিকসের মতো শিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে এআই-এর সফল প্রয়োগ। মার্কেটিং বা প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। বিপণনের বিভিন্ন সেবা ও পণ্য কেনাবেচার জন্য নানা পর্যায় ও চাহিদার ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে বিপণন খাত বরাবরই প্রযুক্তিনির্ভর। জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান শিল্পবিপ্লবের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে, যেখানে মেশিনগুলো চিন্তা করে, শেখে, স্বপ্রতিলিপি তৈরি করে এবং অনেক কাজ আয়ত্ত করতে পারে। স্মার্ট শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে বহুমাত্রিক অ্যাপ্লিকেশনস অসংখ্য শিল্পকে সংযুক্ত করে–এমন বুদ্ধিমান প্রযুক্তিজ্ঞানেই সমৃদ্ধ হতে পারে আগামীর ভবিষ্যৎ।

স্মার্ট পরিবহণ

চালকবিহীন গাড়ির ধারণাটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনি থেকে বাস্তবে পরিণত করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। স্বয়ংক্রিয় যানবাহনগুলো এআই সিস্টেমের মাধ্যমে সজ্জিত, যা সেন্সর থেকে ডেটা নেভিগেট করতে এবং ড্রাইভিং

> স্মার্ট সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন: স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট পুলিশিং, স্মার্ট ট্যুরিজম, স্মার্ট শিল্পোন্নয়ন, স্মার্ট কর্মসংস্থান, স্মার্ট পরিবহণ, স্মার্ট বিচারব্যবস্থা ও স্মার্ট সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এটি কেবল নিরাপদ সড়কের প্রতিশ্রুতিই দেয় না বরং সম্ভাব্য যানজটও কমাতে সক্ষম।

স্মার্ট বিচারব্যবস্থা

পৃথিবীব্যাপী বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সব সময়ই একটি অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করে। ডিজিটাইজেশনের ফলে পৃথিবীর মানুষ এখন আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও আগ্রহী, আরও আস্থাশীল। সনাতন বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে তরুণদের আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখা সম্ভব হবে না। সরকারের ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ সব আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সব নাগরিকের জন্য ন্যায় ও দ্রুত বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

স্মার্ট সাংবাদিকতা

গণমাধ্যম সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণ। সাংবাদিকদের রিপোর্টিং, সৃজনশীলতা এবং পাঠক আকৃষ্ট করার ক্ষমতায় বাড়তি শক্তি জোগাতে পারে বুদ্ধিমান মেশিন। ডেটার ধরন বোঝা এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গতিপ্রকৃতি কেমন হবে, তা শেখার ক্ষমতা রয়েছে অ্যালগরিদমের। শুধু তথ্যকে সাজিয়ে এটি খুঁজে দিতে পারে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মিসিং লিংক বা অজানা যোগসূত্র। এআই যেমন সহজে তথ্যের ট্রেন্ড শনাক্ত করে, তেমনই লাখ লাখ ডেটা থেকে সঠিক তথ্য বের করতে পারে।

স্মার্ট পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইকোসিস্টেম পর্যবেক্ষণ করছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিচ্ছে এবং শক্তির ব্যবহার অপটিমাইজ করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের সবুজ গ্রহকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে নিরাপত্তা ঝুঁকি

সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো একটি দ্বিধারী তলোয়ার। এটি সাইবার হুমকির বিরুদ্ধে রক্ষা করার পাশাপাশি খারাপ উদ্দেশ্যেও অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এআই-চালিত সাইবার আক্রমণগুলো উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করতে সক্ষম। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ঠিক তেমনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে অসংখ্য ইতিবাচক দিকের সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

তথ্য গোপনীয়তার উদ্‌বেগ: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৈশ্বিকভাবে নজরদারি এবং ডেটা লঙ্ঘন সম্পর্কে উদ্‌বেগ সৃষ্টি করছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই স্বর্ণযুগে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেকারত্ব: এআই দ্বারা চালিত অটোমেশন ব্যবস্থায় কিছু সেক্টরে কর্মজীবীরা কাজ হারাচ্ছেন। যদিও এটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, তবুও সেই পরিবর্তনটি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বেদনাদায়ক। এ পরিবর্তনশীল ল্যান্ডস্কেপের জন্য কর্মজীবীদের দক্ষ হিসাবে প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পারস্পরিক বিশ্বাস, পক্ষপাত ও নৈতিক বৈষম্য: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিদ্ধান্ত নৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বৈষম্যকে স্থায়ী করতে পারে, যা একটি নৈতিক উদ্‌বেগের বিষয়। নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো নেভিগেট করার জন্য সতর্ক বিবেচনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বায়োটেকনোলজি ও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীকে নৈতিক কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে সংবাদের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জেনারেটেড সংবাদগুলো ভালোভাবে রিভিউ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বায়োটেকনোলজি ও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীকে নৈতিক কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ... কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তি কেবল এর ক্ষমতার মধ্যেই নয় বরং আমরা কীভাবে এটি পরিচালনা করি, এর ওপরও নির্ভর করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি যথাযথ আইন, নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এর ব্যবহারের ওপর মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তি কেবল এর ক্ষমতার মধ্যেই নয় বরং আমরা কীভাবে এটি পরিচালনা করি, এর ওপরও নির্ভর করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি যথাযথ আইন, নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এর ব্যবহারের ওপর মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কারণ, প্রকৃত অর্থেই আগামীর বিশ্ব হবে শুধু যোগ্যদের বেঁচে থাকার জায়গা; সেক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বায়নের এ যুগে আগামীর প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংবলিত প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে; তাহলেই আমরা সবাইকে নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সত্যিকারের আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সক্ষম হব।

লেখক: অ্যানালিস্ট (সার্ভার ও ক্লাউড সিকিউরিটি), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ রূপায়ণে গণমাধ্যমের ভূমিকা

এএইচএম বজলুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিজ্ঞানশিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে নানামুখী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত শুরু করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে ঘোষিত নির্বাচনি ইশতাহারগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানভিত্তিক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জাতি হিসাবে গড়ার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে ২০২৪ সালের নির্বাচনি ইশতাহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণের জন্য ২০২৫, ২০৩১ এবং ২০৪১-এর সময়রেখার মধ্যে নানামুখী কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ দেশ এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করবে। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিগত ও উদ্ভাবনী। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে। স্তম্ভগুলো হলো: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়।

স্মার্ট নাগরিক

শতভাগ শিক্ষিত নাগরিক নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের ও সমাজের সবার জীবন-জীবিকার মান বদলে দেবে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে তারা সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে; সরকারি ও বেসরকারি খাত প্রদত্ত পণ্য ও সেবা গ্রহণ করবে; দেশবিদেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ঋদ্ধ করে তুলবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের সমস্যা সমাধান করবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট অর্থনীতি

স্মার্ট অর্থনীতি, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, শিক্ষা অথবা ভৌগোলিক দূরত্ব–নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকসের ব্যবহার হবে কৃষি, শিল্প ও সব সেবা খাতে। ক্ষুদ্র-কুটির, মাঝারিসহ সব ব্যবসার পরিবেশ সহজ করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশে উদ্ভাবিত সাশ্রয়ী প্রযুক্তি শিল্প-বাণিজ্যে প্রয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র সহায়তা করবে। কমিয়ে ফেলা যাবে কায়িক শ্রম, সম্পদের হবে সুষ্ঠু ব্যবহার, কমবে অপচয়, বাড়বে উৎপাদনশীলতা, খরচ কমবে উৎপাদনের; উৎপাদন হয়ে উঠবে প্রতিযোগিতামূলক ও প্রসারিত এবং বৈচিত্র্যময় হবে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার। তথ্যপ্রযুক্তি সহযোগে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাবে ত্বরিত ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত; সহজে করা যাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠবে দক্ষ।

স্মার্ট সরকার

প্রযুক্তির ব্যবহার সরকার পরিচালনাব্যবস্থাকে দক্ষ, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে। সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে। সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তই হবে জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর; প্রতিটি সেবা হবে চাহিদা অনুযায়ী এবং সমন্বিতভাবে। আইওটি, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং প্রভৃতি প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে স্মার্ট নাগরিকদের স্মার্ট প্রতিনিধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকার পরিচালনার সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করবে। সরকার তথা রাষ্ট্র হয়ে উঠবে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

স্মার্ট সমাজ

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রযুক্তির মাধ্যমে দূর করা যাবে সব ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট সমাজে নাগরিক জ্ঞানচর্চা ও প্রয়োগের সুযোগ পাবেন বেশি। সঠিক তথ্যপ্রবাহের ফলে কমে যাবে ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণ। প্রযুক্তি ব্যবহার সংস্কৃতিচর্চা, বিনোদন ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের সময় ও সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট জাতি গঠনই পরবর্তী লক্ষ্য। দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার, মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজের জন্য ডিজিটাল সংযোগ মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। আর এর অধিকাংশ এখন বিশ্বের মানুষের কাছে দৃশ্যমান হয়ে গেছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ রোডম্যাপের চারটি পিলার স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্ন্যান্স।

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে:

১. বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ ভিশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠিত হয়েছে।
২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলা এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসতে ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভারনারেবল এক্সেপশন (ডাইভ) উদ্যোগের আওতায় আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।
৩. শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিতে 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম'-এর আওতায় ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
৪. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন।
৫. ক্ষুদ্র, কুটির, ছোটো, মাঝারি ব্যাবসাগুলোর জিডিপিতে অবদান বাড়াতে এন্টারপ্রাইজভিত্তিক ব্যাবসাগুলোকে বিনিয়োগ উপযোগী স্টার্ট-আপ হিসাবে প্রস্তুত করা।
৬. অলটারনেটিভ স্কুল ফর স্টার্ট-আপ এডুকেশন অব টুমোরো (এসেট) প্রতিষ্ঠা।
৭. বাংলাদেশ নলেজ ডেভেলপমেন্ট পার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা।
৮. সেন্টার ফর লার্নিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব নলেজ (ক্লিক) স্থাপন।
৯. এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরিজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠা।
১০. সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিড) প্ল্যাটফরম স্থাপন।
১১. কনটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লিংকেজ ল্যাব (সেল) স্থাপন।
১২. সার্ভিস অ্যাগ্রিগ্রেটর ট্রেইনিং (স্যাট) মডেলে সরকারি সেবা ও অবকাঠামোনির্ভর উদ্যোক্তা তৈরি করা।
১৩. সব ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসা।
১৪. ডেটা নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সার্ভিস আইন, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (শিফট) আইন, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ একাডেমি (আইডিয়া) আইন, এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরিজন (আকাশ) আইন, ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি আইন ও জাতীয় স্টার্ট-আপ পলিসি প্রণয়ন।

ইতোমধ্যে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে প্রবেশ করছি। স্মার্ট বাংলাদেশ মূলত ফিজিক্যাল, ডিজিটাল ও বায়োলজিক্যাল–এ তিনটি ক্ষেত্রকে এমনভাবে একীভূত করতে চলেছে, যা আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি সক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প উৎপাদনের নতুন ধারায় তুলনীয় সক্ষমতা ছাড়া গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে সম্পৃক্ত থাকা সম্ভব নয়। দূরদর্শী নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান; যার সাফল্যের ভিত্তিতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

এমতাবস্থায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে রয়েছে গণমাধ্যম এবং তথ্যপ্রবাহের দীর্ঘদিনের চর্চা। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন

ঘটানোর পাশাপাশি গণমাধ্যম জাতিকে পথরেখা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের যুগে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ডিজিটাইজেশন সাংবাদিকতায় প্যাড-কলমের যুগের অবসান ঘটিয়েছে। ডিজিটাল যন্ত্রের ব্যবহার ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন সাংবাদিকতার জন্য এখন অপরিহার্য।

প্রচলিত মিডিয়া থেকে বহুগুণ বেশি তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল মিডিয়াকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। তথ্য-উপাত্ত পাঠক ও দর্শকের কাছে অডিয়ো, ভিডিয়ো কিংবা প্রিন্ট ভার্সনে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপনের বিষয়টিও স্মার্ট যুগের সাংবাদিকতার জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। তথ্যপ্রযুক্তির নতুন নতুন মাত্রা আসবে। এ তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করতে হবে।

নানামুখী ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দুরূহ প্রকৃতি অনুধাবনের পাশাপাশি সমাজের নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করা এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে গণমাধ্যম, তথ্য ও বিনোদনে পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করে কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তা জানতে ও বুঝতে হবে। এটি এক মহা পরিবর্তন এবং আমাদের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে গণমাধ্যম, তথ্য ও বিনোদনজগৎ বাংলাদেশে পাচ্ছে নতুন এক আঙ্গিক। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে কেমন হবে আমাদের গণমাধ্যম, তথ্য ও বিনোদনজগৎ এবং এর প্রভাবে আর্কাইভের মাধ্যমে আমাদের সময়ের সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রাখা।

প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধি করে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় নির্বাচনি ইশতাহার ২০১৮ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের মাধ্যমে ৩.২১ অনুচ্ছেদে লক্ষ্য ও পরিকল্পনার শুরুতেই ঘোষণা করেছেন, '২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভ-জি চালু করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, বিগ ডেটা, ব্লক চেইন, আইওটিসহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে।' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

ইতোমধ্যে আমাদের গণমাধ্যমের ওপর প্রভাবগুলো পড়তে শুরু করেছে। শ্রোতারা ভিডিয়ো কনটেন্ট দেখতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে। ২-৩ বছরের মধ্যে অডিয়ো কনটেন্টের ৯০ ভাগ উন্নীত হবে ভিডিয়ো কনটেন্টে। দেশে ফাইভ-জি মোবাইল চালু হচ্ছে। গণমাধ্যমকে চলে যেতে হবে ডিজিটাল সম্প্রচারে।

স্মার্ট বাংলাদেশে মূলত ফিজিক্যাল, ডিজিটাল ও বায়োলজিক্যাল–এ তিনটি ক্ষেত্রকে একীভূত করে তার প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম চলবে। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি মহাপরিবর্তন। এ পরিবর্তনের সঙ্গে গণমাধ্যমকে খাপ খাওয়াতে হবে। গণমাধ্যমকে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজন করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের গণমাধ্যমের প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ বিবর্তন ও কৌশল নিরূপণ করছে, যা বাংলাদেশের সম্প্রচার শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে

আমরা কীভাবে টিকে থাকব–এ বাস্তবতার আলোকে আমাদের এমন পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হবে, যা শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বিকাশে গণমাধ্যম, তথ্য ও বিনোদনজগতের ভূমিকাকে আরও জোরালো ও যুগোপযোগী করবে। তাহলেই কেবল চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে এ ক্ষেত্রগুলো যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে, তা আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের গণমাধ্যমের প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ বিবর্তন ও কৌশল নিরূপণ করছে, যা বাংলাদেশের সম্প্রচার শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে রেডিয়ো, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ায়। প্রিন্ট মিডিয়া ও সম্প্রচারকারীদের সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের বর্তমান অবস্থা কী এবং শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর চ্যালেঞ্জগুলো কী? তাদের আগ্রহের প্রাসঙ্গিক ও সর্বজনীন বিষয়গুলো কী এবং কীভাবে আমরা আমাদের ভালো অনুশীলনগুলোকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তির দৌড়ে সম্পৃক্ত করতে পারি; সংবাদ পরিবেশন ও সম্প্রচারের মান উন্নত করতে পারি, তা নিয়ে কাজের অবতারণা করা। এছাড়া আলোচ্য বিষয় তৈরিতে সর্বশেষ প্রযুক্তির মিশ্রণ ঘটাতে হবে, পুরোনো গণমাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা এবং নতুন মিডিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অথবা পরিপূরক হিসাবে গড়ে তোলা, ভুল বা ভুয়া খবর এবং নতুন গণমাধ্যম, প্রযুক্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমের কনটেন্ট বা আলোচ্য বিষয় বণ্টন,

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণে গণমাধ্যম ইতোমধ্যে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। প্রযুক্তিগত নানা উদ্ভাবনের ফলে দেশের জনগণের হাতে এখন মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। এসব ডিজিটাল পরিষেবা জনগণের ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক প্রযুক্তি অর্জনে ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি মানুষের গণমাধ্যম বিষয়ক রুচি ও চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

মোবাইল ফোন আসায় বিভিন্ন গণমাধ্যম এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আধেয় ও বিষয়বস্তুর গভীর সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করেছে। সংবাদ পরিবেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নতুন প্রযুক্তিতে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে গণমাধ্যমগুলোয় বিজ্ঞাপনের হারও কমতে শুরু করেছে। আবার সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ভুয়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন খবর গণমাধ্যমগুলোর জন্য একটি বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ।

রেডিয়ো ও টেলিভিশনের জন্য প্রচলিত ফরম্যাট পর্যালোচনা করে নতুন নতুন ফরম্যাট উদ্ভাবন করা এবং অনুশীলন করার জন্য তাগিদ প্রদান। গণমাধ্যম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন এবং অন্য অগ্রসর দেশগুলো থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন। সময় বদলেছে! প্রথাগতভাবে যে অর্জন হয়েছে, তা আমরা প্রত্যাখ্যান করতে

চাই না। কিন্তু এটা সত্য, আধুনিকীকরণ এমন একটি পদ্ধতি, যার ওপর প্রযুক্তির কর্তৃত্ব রয়েছে, বাজারের ওপর প্রভাব রয়েছে, যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ নিরূপণের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, গণমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম গণতন্ত্রের জন্য পূর্বশর্ত। সে মোতাবেক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

প্রথমত–গণমাধ্যমের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রগতি, দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো জনগণের মাঝে নানামুখী প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের মাধ্যমে পৌঁছানো। স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে জনগণকে প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় এনে নানামুখী প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং সময় সময় অগ্রগতিগুলো তুলে ধরা। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়ায় আরও কী কী বাস্তবায়নগত সুযোগ আছে, তা তুলে ধরা এবং স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

দ্বিতীয়ত–গণমাধ্যমের নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

তৃতীয়ত–গণমাধ্যমবিষয়ক গবেষণা জোরদার করা।

স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে অভিযোজন করা আবশ্যক

১. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনাকে স্মার্ট ব্যবস্থাপনায় পরিণত করা, কর্মরত সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম পেশাজীবীদের Re-Skilling ও Up-Skilling এর আওতায় আনা। গণমাধ্যমের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা, যাতে সবার মধ্যে একটি যুক্তিসংগত উপলব্ধি তৈরি হয়। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কারিকুলাম পর্যালোচনা করে স্মার্ট বাংলাদেশ উপযোগী করা। গণমাধ্যমে কর্মরত সব পর্যায়ের পেশাজীবীদের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন।

২. 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিষয়ক ইউনিট রাখা এবং মাঠপর্যায়ে তথা জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। বিশেষ করে ডিজিটাল সমাজ, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং ডিজিটাল অবকাঠামো সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৩. প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি সংবাদ গাইডলাইন প্রণয়ন করা। প্রচারিত সংবাদকে মূল্যায়ন করে সময় সময় জাতীয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করা। গণমাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সক্ষমতা এবং নতুন নতুন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদক পর্যায়ে সংলাপের আয়োজন করা।

৪. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব প্রশিক্ষণব্যবস্থা জোরদার করা এবং নিজস্ব কারিকুলামে মোবাইল জার্নালিজম, ডেটা ড্রিভেন জার্নালিজম, ইনফোগ্রাফিকস তৈরি, সংবাদ প্রণয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, ব্লক চেইন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তকরণ। গণমাধ্যম উন্নয়নবিষয়ক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর গণমাধ্যমবিষয়ক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজন করা।

৫. গণমাধ্যম উন্নয়নবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গণমাধ্যম শিল্পের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংবাদিকতা শিক্ষাবিষয়ক আন্তসংলাপ জোরদারকরণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্মার্ট বাংলাদেশবিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স কিংবা ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম আয়োজনে সহায়তা করা। প্রচলিত গবেষণাগুলো বিবেচনায় রেখে নতুন নতুন বিষয়ে Action Research এর অবতারণা করা।

আমরা আশা করি, গণমাধ্যমের ভূমিকা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রক্রিয়ায় অভিযোজিত হয়ে একটি জ্ঞাননির্ভর বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

লেখক: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)

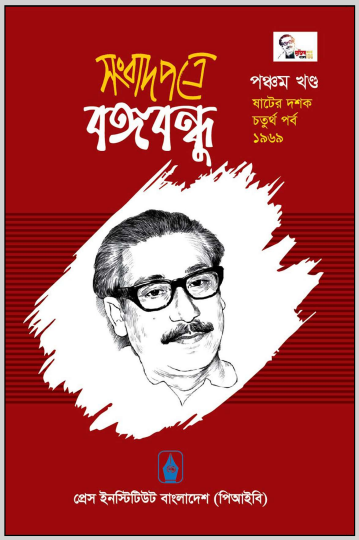

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেধাসম্পদের গুরুত্ব

জাফর রাজা চৌধুরী

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রপঞ্চ দুটি–প্রথমত: স্মার্ট বাংলাদেশ এবং দ্বিতীয়ত: মেধাসম্পদ। স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও স্লোগান। দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের রূপকল্প। এ স্মার্ট বাংলাদেশের মূলভিত্তি চারটি–স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য দরকার স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহণ, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, আধুনিক ও কল্যাণমুখী নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, উন্নত কৃষি, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ ও দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ। এছাড়া সব ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আজ থেকে প্রায় দেড় দশক আগে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে হাতে নিয়েছিল। যার সাফল্য এখন বাংলাদেশের সর্বত্র বিরাজমান। ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্থ হচ্ছে–রাষ্ট্রের সম্ভাব্য সব সেবামূলক কার্যক্রমকে উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা, যাকে এককথায় ডিজিটাইজেশন বলা যায়। বলা বাহুল্য, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সর্বোচ্চ। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের পাসপোর্টের কথা বলা যায়। একসময় আমাদের দেশের পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অনেক দেশেরই ভ্রুকুটি ছিল। কিন্তু সেই

পাসপোর্টকে যখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর মেশিন রিডেবল পাসপোর্টে রূপান্তর করা হলো, তখন এর গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের এক মেধাবী তরুণ আইটি বিশেষজ্ঞ মীর শাহরুখ খুব সহজবোধ্য ভাষায় ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশকে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁর ভাষায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে আগে যে পাসপোর্টের ফর্ম আমরা হাতে পূরণ করতাম, সেটা যখন আমরা অনলাইনে পূরণ করতে শুরু করলাম, তা ছিল আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর স্মার্ট বাংলাদেশ হলো, আমি যখন পাসপোর্ট ফর্মটা অনলাইনে পূরণকালে আমার এনআইডি বা ফোন নম্বর দেওয়ামাত্র আমার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি যেমন: নাম, পিতা/স্বামীর নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পূর্ববর্তী পাসপোর্ট নম্বর, জন্মতারিখ প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফর্মে উঠে আসবে। এমনকি আমার ছবি তোলা ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়ার প্লট, স্থান, সময়, প্রয়োজনীয় ফির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যও তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে অনলাইনে জানিয়ে দেওয়া হবে; এখানেই শেষ নয়। ফি জমা দেওয়ার জন্য আমার ব্যাংকে যাওয়ার দরকার নেই। নির্ধারিত ফি আমি ঘরে বসেই আমার ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে পরিশোধ করতে পারব। সংক্ষেপে, ডিজিটাল টেকনোলোজির ওপর ভিত্তি করে সেবাগ্রহীতার সেবাকে সহজ, সুগম ও দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পন্ন করাই হলো স্মার্ট বাংলাদেশের অন্তর্নিহিত বার্তা।

আলোচ্য বিষয়ের দ্বিতীয় ও মূল প্রপঞ্চ 'মেধাসম্পদ'। মেধাসম্পদ সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য তুলে ধরছি। মেধাসম্পদ সুরক্ষার প্রাচীনতম উদাহরণ হলো, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর, যখন গ্রিসের সাইবারিস শহরে একজন বেকারকে এক বছরের জন্য একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছিল, যিনি একটি নতুন ধরনের রুটি আবিষ্কার করেছিলেন। (Intellectual Property Law by A.S.M. Sayem Ali Pathan, P. 1) মধ্যযুগে, কারিকরদের স্বার্থরক্ষার জন্য গিল্ড গঠিত হয়েছিল। এ গিল্ডগুলোর নিয়ম অনুসারে সদস্যরা নিজেদের বাণিজ্য গোপনীয়তা বহিরাগতদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারতেন না।

পরবর্তী সময়ে রেনেসাঁর আবির্ভাবে কলা ও বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে আরও জোরালোভাবে আইপি সুরক্ষার চাহিদা দেখা দেয়। ১৪৭৪ সালে ভেনিসে বিশ্বের প্রথম পেটেন্ট আইন পাশ হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ১৭১০ সালে 'Statute of Anne' নামে বিশ্বে প্রথম কপিরাইট আইন পাশ হয়, যা লেখকদের তাদের রচিত গ্রন্থের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৪৫১ সালে জার্মানির গোটেনবার্গে আধুনিক প্রিন্টিং মেশিন ও প্রায় সমসাময়িককালে চীনে কাগজের আবিষ্কার এবং পরবর্তী সময়ে শিল্পবিপ্লব, আইপি আইনের বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করে। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবক ও তাঁদের অধিকার রক্ষা করা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ১৭৯৩ সালে কোনো মেধাস্বত্বের প্রথম পেটেন্ট প্রদান করে। ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনভেনশনে শিল্পসম্পদ সুরক্ষার জন্য 'Paris Convention for the Protection of Industrial Properties' নামক চুক্তি সই হয়, যা আইপি সুরক্ষার জন্য প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। এর কিছুদিন পর ১৮৮৬ সালে সুইজারল্যান্ডের বার্ন কনভেনশনে 'Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works' শীর্ষক চুক্তি সই হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী সাহিত্য ও শৈল্পিক কর্ম সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে।

Intellectual Property বা মেধাস্বত্ব নিয়ে আলোচনার আগে সম্পদ বলতে আমরা কী বুঝি, এ বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করা দরকার। সংক্ষেপে সম্পদ বলতে আমরা বুঝি, যার বিনিময়মূল্য আছে, যা ব্যবহার উপযোগী তথা উপভোগ করা যায়। যেমন: জমি, গাড়ি, বাড়ি, বই, গান, সিনেমা প্রভৃতি। সম্পদ আবার দুভাগে বিভক্ত: বস্তুগত সম্পদ ও মেধাসম্পদ। বস্তুগত সম্পদ দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য, অপরদিকে মেধাসম্পদ অশরীরী ও স্পর্শযোগ্য নয়; যেমন: বাড়ি-গাড়ির শরীর আছে, বাড়ি-গাড়ি নির্মাণ করতে হলে ডিজাইন লাগে। আর এ ডিজাইন করার জন্য মস্তিষ্ক তথা মেধা প্রয়োজন। এ মেধা বা মস্তিষ্কের ক্ষমতা ঐশ্বরিক, বহুলাংশে জন্মগত। যা অশরীরী এবং অদৃশ্যমান, অনেকটাই অক্সিজেনের মতো, অনুভব বা উপলব্ধি করা যায়; কিন্তু দেখা যায় না।

'Intellectual Property is the creation of the mind.' মেধাসম্পদ একটি মস্তিষ্কজাত অধিকার। একে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদও বলা হয়ে থাকে। মেধাস্বত্বের ইংরেজি পরিভাষা 'Intellectual Property' অর্থে কোনো মৌলিক সৃষ্টির 'অনুলিপি তৈরির অধিকার' বোঝায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ অধিকারগুলো সীমিত সময়ের জন্য সংরক্ষিত থাকে। Universal Copyright Convention অনুসারে মেধাস্বত্ব বা কপিরাইটের আন্তর্জাতিক চিহ্ন হলো © (এতে ইংরেজি Copyright শব্দের আদ্যাক্ষর C-কে একটি বৃত্তের ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে)।

সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শিল্পের বিভিন্ন কাজের মধ্যে মেধাস্বত্ব বিদ্যমান। উদ্ভাবন, আবিষ্কার, ভৌগোলিক নির্দেশক বন্ধু, ট্রেডমার্ক, কবিতা, অভিসন্দর্ভ, নাটক এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, চলচ্চিত্র, নৃত্যবিন্যাস (নাচ, ব্যালে ইত্যাদি), সংগীত রচনা, ধারণকৃত শব্দ, চিত্রকর্ম, অঙ্কন, মূর্তি বা প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, সফটওয়্যার, ডিজিটাল প্ল্যাটফরম, বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে সম্প্রচার এবং শিল্পনকশা ডিজাইন ও আর্কিটেকচারাল ডিজাইন প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মেধাস্বত্ব আইন কর্মের ধারণা, ফ্যাক্ট, স্টাইল বা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। যেমন: মিকিমাউস কার্টুনে মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত থাকায় অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ কার্টুন ব্যবহার বা বিতরণ করতে পারে না; এছাড়া ডিজনির সৃষ্ট মিকিমাউসের মতো একই রকম কোনো ছবির অনুলিপি বা হুবহু নকল করা যায় না; তবে এ আইন সাধারণভাবে মিকিমাউসের মতো অন্য কোনো ইঁদুর আঁকতে বা সৃষ্টি করতে বাধা দেখে না, যতক্ষণ না সেগুলো ডিজনির মূল নকশা থেকে যথেষ্ট রকম ভিন্ন হয় এবং মিকিমাউসের অবিকল নকল না হয়।

মেধাস্বত্ব দুভাগে বিভক্ত

Creative/Aesthatic: মেধাস্বত্বের সৃজনশীল বা নান্দনিক অংশ কেবল মেধা ও মনন থেকে উৎসারিত; যা অনুভূত হয়, কিন্তু কখনই দেখা যায় না। তবে এর দ্বারা সৃজিত বস্তু দৃশ্যমান। যেমন: সাহিত্য, সংগীত, সিনেমা, পেইন্টিং, সাউন্ড রেকর্ডিং, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনস, মোবাইল গেমস প্রভৃতি। কপিরাইট আইন মূলত মেধাস্বত্বের এ সৃজনশীল বা নান্দনিক কর্মের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে।

Industrial/Commercial: মেধাস্বত্বের শিল্প বা বাণিজ্যিক অংশ, যা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এটি মূলত মেধাস্বত্বের সৃজনশীল অংশের উদ্ভাবিত কর্মের বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে কাজ করে। যেমন: ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, ডিজাইন, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রভৃতি আইন।

বস্তুগত সম্পদ যেমন মলিকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যায় না, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদও স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহারযোগ্য নয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্ব সংরক্ষণের অধিকারই হচ্ছে 'কপিরাইট'। এ কপিরাইট নিরঙ্কুশভাবে মানুষের মস্তিষ্কজাত অধিকার। আমরা জানি, বস্তুগত সম্পদ যেমন:

মেধাসম্পদ একটি মস্তিষ্কজাত অধিকার। একে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদও বলা হয়ে থাকে। ... সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শিল্পের বিভিন্ন কাজের মধ্যে মেধাস্বত্ব বিদ্যমান

বাড়িগাড়ি তৈরিতে প্রয়োজন মূলত শারীরিক পরিশ্রম। এতে মানুষের বিশেষ ধরনের অধিকার বা স্বত্ব আছে, তবে কপিরাইট নেই। কিন্তু বাড়ি-গাড়ির নকশা সবাই বানাতে পারেন না। এর জন্য মূলত প্রয়োজন মেধা। তাই এ নকশা বা ডিজাইনের মেধাস্বত্বের কপিরাইট আছে।

এখন আসুন তুলনা করে দেখি বস্তুগত সম্পদ না বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মালিক–কে বেশি ধনী? এক ভূস্বামী ছেলের জন্য প্রচুর সম্পদ রেখে মারা যান। ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন একটা ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর প্রচুর ইয়ারবন্ধু জুটে গেলে। তাস, পাশা, জুয়া আর বন্ধুদের উলটাপালটা পরামর্শে ব্যাবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে, ধনী পিতার সন্তান এখন প্রায় পথের ফকির। অন্যদিকে এক দরিদ্র পিতার মেধাবী সন্তান নিজ বুদ্ধিবলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামান্য জমিতে ধানের পরিবর্তে স্থানীয় চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফলের চাষ শুরু করে। আশপাশের সবাইকে বুঝিয়ে তাদের জমিতেও সবজি ও ফলের চাষ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সবার উৎপাদিত ফসল একত্রিত করে শহরে নিয়ে বিক্রি করে, এখন সে রীতিমতো স্বাবলম্বী ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে ধন দিয়ে কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মালিক হওয়া যায় না; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দিয়ে সহজেই বস্তুগত সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ বিস্তৃত ও অবারিত।

মেধাসম্পদভিত্তিক অর্থনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কিন রাজনীতিক, লেখক ও নিউইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, 'The Creative Economy is one of the most powerful engines of growth and development, and it can serve as a path out of poverty for countries in the development world. But in order for this to happen, there must be strong & effective protections for Intellectual Property'. এ উক্তিতে মেধাসম্পদকে আইন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাধ্যমে যথাযথভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে। তবে এর সঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানো দরকার, যাতে মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও বিকাশের প্রকৃত পরিবেশ গড়ে ওঠে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতে হলে আমাদেরকে স্মার্ট নাগরিক হিসাবে প্রস্তুতি নিয়ে স্মার্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন, টেকনোলজিভিত্তিক শিক্ষা। পাশাপাশি জীবনযাত্রার সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে টেকনোলজির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ও সর্বজনীন ব্যবহার। এর জন্য দরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতে, সর্বাধিক গুরুত্বারোপ এবং বাজেটের উপযুক্ত প্রতিফলন ও প্রচুর প্রণোদনা স্বীকৃতি। আবার স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার কৃষি, শিল্প, সব উৎপাদন খাতসহ সরকারের সমুদয় সেবা খাতকে সম্পূর্ণভাবে টেকনোলজির আওতায় নিয়ে আসা। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক খাত যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনই সরকারের সেবা খাতও হয়ে ওঠবে কার্যকর, দ্রুততর ও দুর্নীতিমুক্ত। তবে এর জন্য দরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাত যথা: কম্পিউটার প্রোগ্রাম, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, সফটওয়্যার, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন, ওয়েবসাইট, ডিজিটাল প্ল্যাটফরম, তথ্যসম্পদ প্রভৃতি মেধাসম্পদের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ত উদ্ভাবনের পাশাপাশি উদ্ভাবিত কর্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কারণ, উদ্ভাবিত সৃজনশীল কর্মের তথা মেধাসম্পদের বিকাশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা ব্যতিরেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার প্রত্যাশা করা হবে অনেকটাই সুদূরপরাহত।

ইন্টারন্যাশনাল প্রোপার্টি রাইটস ইনডেক্স ২০১৮ অনুযায়ী কপিরাইট সংরক্ষণে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৫টি দেশের মধ্যে ১২২তম। বিজনেস সফটওয়্যার অ্যালাইনস (বিএসএ) পরিচালিত গ্লোবাল সফটওয়্যার সার্ভের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বাংলাদেশে পাইরেটেড সফটওয়্যারের ব্যবহার হয়েছে প্রায় ২৩ কোটি ৬০ লাখ ডলারের। এ পরিসংখ্যান থেকে কপিরাইট আইন প্রয়োগে আমাদের দীনতার চিত্র প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে দ্রুততার সঙ্গে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে যথাযথভাবে আইপি আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আইপি আইন হলো একটি জটিল ও বৈশ্বিক ব্যবস্থা; যা উদ্ভাবন, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট এবং শিল্পনকশাসহ বিস্তৃত সৃজনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে। বলা বাহুল্য, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচারের জন্য আইপি আইন অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

আমাদের অর্থনীতিতে উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধির জন্য মেধাস্বত্বের সুরক্ষা অপরিহার্য। কারণ, এর মাধ্যমে মূল কাজের নির্মাতা বা স্বত্বাধিকারীর প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগকে পুরস্কৃত করা হয় এবং তাদের সৃষ্ট কর্ম অননুমোদিত ব্যবহার থেকে রক্ষা পায়। মেধাসম্পদ যেহেতু ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতাই এ সম্পদের উৎস। পৃথিবীর সব উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে মেধাসম্পদের ছোঁয়া আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের এ যুগে মানুষের মৌলিক মেধাসম্পদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন খাতে, বিশেষ করে প্রযুক্তি খাতে মেধাসম্পদ অধিকার এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা সঠিকভাবে করতে পারলে নতুন উদ্ভাবন ও নির্মাণশৈলী আগামী বিশ্ববাজারে দেশের

অর্থনৈতিক অবস্থানকে মজবুত ও বিশ্বদরবারে নতুন ব্র্যান্ড তৈরি করবে।

গত বছর (২০২৩) ২৩ ফেব্রুয়ারি বেসিস আয়োজিত এক সভায় সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ এবং শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর–এ দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সফটওয়্যারের কোনো বিকল্প নেই। এখন বাংলাদেশের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিজের সাইজ প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের, যার মধ্যে রয়েছে ১.৮ বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট মার্কেট। একাডেমিক রিসার্চ, সরকারি সহায়তা এবং ইন্ডাস্ট্রির জন্য সুযোগ নিশ্চিত করে সফটওয়্যার, মোবাইল গেমস ও বিভিন্ন ডিজিটাল কনটেন্ট রপ্তানির মাধ্যমে ৫ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় সম্ভব মর্মে বেসিস সভাপতি সভায় মন্তব্য করেন। শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে দেশে একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। সফটওয়্যার শিল্প একটি উদ্ভাবনী, সৃজনশীল ও সেবা শিল্প। বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে সফটওয়্যার ও প্রযুক্তির ব্যবহার এক অসীম সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং স্বত্ব নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যত বেশি আইপি সচেতন হবে, আইপি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, ট্রেডমার্ক বা কপিরাইট লঙ্ঘনের হার তত কমে যাবে। ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনাও তত বাড়বে। শক্তিশালী ও কার্যকর আইপি সুরক্ষা, প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, দেশে বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। আমরা যত, জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগাব, তত সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে পারব।

মেধাসম্পদ অধিকার সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতার তীব্র অভাব বাংলাদেশে মেধাসম্পদের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। এ সচেতনতার অভাব মানুষকে মেধাসম্পদ অধিকারের প্রতি অবহেলা এবং লঙ্ঘনের দিকে ধাবিত করে। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো, আইনি ব্যবস্থার শ্লথগতি। বাংলাদেশে মেধাসম্পদ অধিকার সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া যথেষ্ট ধীর, জটিল, মামলা নিষ্পত্তি হতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। আইনি ব্যবস্থায় এ শ্লথগতি মেধাসম্পদের স্রষ্টা বা উদ্ভাবককে মেধাসম্পদের অধিকারের আইনি সুরক্ষা চাইতে নিরুৎসাহিত করে।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার দেশে মেধাসম্পদ অধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি হলো ২০১৮ সালে জাতীয় উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ অধিকার নীতি গ্রহণ করা। এ নীতির লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে মেধাসম্পদ অধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

পরিশেষে বলা যায়, মেধাসম্পদ সুরক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ সম্ভব। মেধাসম্পদ সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলে এবং মেধাসম্পদ সুরক্ষা আইন-প্রবিধানকে শক্তিশালী ও এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে।

লেখক: সাবেক রেজিস্ট্রার ও বর্তমান বোর্ড সদস্য, কপিরাইট অফিস

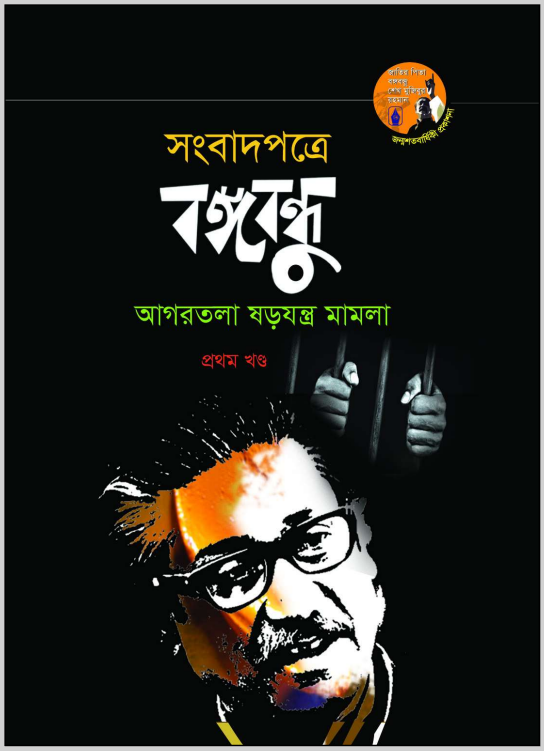

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

স্মার্ট সংবাদমাধ্যমের স্মার্ট প্রক্রিয়া

জাফর ওয়াজেদ

প্রশ্নটা মনে আসা স্বাভাবিক, আর দেড় দশক পর যখন 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবে সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন সংবাদমাধ্যমের স্বরূপ কেমন হবে? চাইলেই কি মাধ্যমটি স্মার্ট হয়ে যাবে? একটি দেশ বা রাষ্ট্রের স্মার্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে পরিক্রমা, তাতে সংবাদমাধ্যম কতটা ভূমিকা রাখবে? জবাব অবশ্য ব্যাপকার্থে রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি। প্রথমত স্মার্ট সিটিজেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবেন। দ্বিতীয়ত, স্মার্ট ইকোনমিকের ক্ষেত্রে অর্থনীতির সব কার্যক্রম হবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তৃতীয়ত, স্মার্ট গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে জনগণ পরিচালিত হবে সরকার দ্বারা। চতুর্থত, পুরো সমাজই হয়ে উঠবে স্মার্ট সোসাইটি। এই চারটি ভিত্তিকে সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ। ২০৪১ সাল নাগাদ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। আর এই হয়ে ওঠার জন্য গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমকে রাখতে হবে জোরালো ভূমিকা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ ডিজিটালের সীমানা অতিক্রম করে স্মার্টের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সংবাদমাধ্যম এখনো ডিজিটাইজেশন যুগে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে যথেষ্ট এগিয়ে আছে বলা যায়।

এটা তো অনস্বীকার্য যে, সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন মাত্রা নিয়ে সামনে হাজির হচ্ছে। একই সঙ্গে নানামুখী বিকাশ ঘটছে তথ্যপ্রযুক্তিরও। দ্রুত

বদলে যাচ্ছে অনেককিছুই। কিছুই দীর্ঘসময় থাকছে না। আবার ধরনধারণেও আসছে পরিবর্তন। আর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে গণমাধ্যম তথা সংবাদমাধ্যমকে। এই পথপরিক্রমার মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানাবিধ বিষয়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের। সামলে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তুলতে না তুলতে তা হয়ে যাচ্ছে পরিত্যাজ্য। এসে যায় নতুন আরেক প্রযুক্তি। এভাবেই একুশ শতকে এসে সংবাদমাধ্যমের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত। বেড়েছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ। তথ্যের চাহিদা তীব্রতর হয়েছে জনগণের কাছে। নেটিজেন মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের নানামুখী মাধ্যমও বেড়েছে।

মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছিলেন, 'মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ।' এর পরিবর্তে এখন, 'ম্যান ইজ দ্য ম্যাসেজ মিডিয়া।' ব্যক্তিমানুষ এখন সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি নিজেই এখন সংবাদ উৎপাদন থেকে সম্প্রচার পর্যন্ত করছে। ফলে প্রথাগত গণমাধ্যমের চেয়ে ডিজিটাইজেশন সংবাদমাধ্যমকে বেশি প্রভাবিত করছে। অনলাইন মাধ্যম দেশের সব নাগরিককে সংবাদমাধ্যমে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে, এটাই বাস্তবতা। ব্যক্তির সংবাদমাধ্যম প্রভাবিত করার সক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আবার অনেকেই বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ছড়িয়ে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, আদর্শগত বা অন্য কোনো স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। এর মধ্যে রয়েছে অসম্পাদিত মাধ্যমেরও বহর এবং বাহার।

চলমান বিশ্বের গতিময়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণমাধ্যমে এখন স্যাটেলাইট প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা অত্যধিক। অবশ্য এতে সংবাদপত্রের চাহিদা জনমনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায় খুব একটা পরিবর্তন হয়তো হয়নি। তবে পাঠক-পরিধি কমেছে। যদিও সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মানুষ প্রথম তথ্যভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। মানুষের অধিকার রক্ষা করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সংবাদমাধ্যম। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সুশাসন বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যম। এসব মাধ্যমের ভূমিকা হয়ে উঠেছে আরও বহুমুখী। সংবাদপত্রের চাহিদা আছে বলেই প্রকাশনার ধারণা এখনো ঊর্ধ্বমুখী। তবে সংবাদমাধ্যমের দায়বদ্ধতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

সংবাদমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাও ঘটছে। এসব নতুন কিছু নয়। এসবই সংবাদের মতোই। মূলত ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে। আর্থিক ও আদর্শিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের তথ্য সমাজে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। ডিজিটাল মাধ্যম উদ্ভবের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যাপক প্রসারিত হয়। এদেশে গুজব খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হয় এবং মানুষ তা বিশ্বাস করে। আসল তথ্য সামনে না এলে গুজবের পাল্লা ভারী হতে বাধ্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক একটি অসম্পাদিত মাধ্যম। এর ব্যবহারকারীর বেশির ভাগই প্রযুক্তির সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে ফেসবুকে প্রচারিত সব ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেয়। তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে না যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বার্থে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করেছেন কিনা। তাই ফেসবুকে গুজব, ভুয়া তথ্য, ভুয়া সংবাদ অনায়াসে প্রচার করা যায়। এই মাধ্যমের গুজবে অনেক সংবাদমাধ্যমকে প্রভাবিত হতে দেখা গেছে। ইউনেস্কোর মতে, আমরা এখন 'ভুল তথ্যযুদ্ধের (ডিজইনফরমেশন ওয়ার) জগতে' বাস করছি। যেখানে শুধু সামাজিক মাধ্যমগুলো নয়, বরং মূলধারার সংবাদমাধ্যমেও ভুল, মিথ্যা ও অপতথ্য ছড়িয়ে পড়ছে। ইউনেস্কো আরও বলেছে, এখন সম্মিলিতভাবে মিথ্যা ও অপতথ্য তুলে ধরতে গিয়ে 'তথ্য বিশৃঙ্খলা' বা 'ইনফরমেশন ডিজঅর্ডার' বেরিয়ে আসছে। যুক্তরাজ্যের 'ডিজিটাল, কালচার, মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্টস' বিষয়ক সংসদীয় কমিটি বলেছে, বিশ্বব্যাপী কর্তৃপক্ষ ও রাজনীতিকরা সামাজিক মাধ্যমকে প্রচার ও নাগরিক সম্পৃক্ততার সরঞ্জাম হিসাবে যত গ্রহণ করছে, অনলাইন জগতে তত অতিরঞ্জিত ও অপতথ্যের প্রসার ঘটছে। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে বিভিন্ন দেশে অসত্য তথ্য ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে। এসব কিছু এখন পেশাদাররা 'শিল্পের' পর্যায়ে নিয়ে গেছে প্রায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সাদেকা হালিম মনে করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ এই দুটি প্রত্যয়ের, বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে। ইতিবাচক দিক হচ্ছে–আমরা হাতের মুঠোয় খবর পাচ্ছি। ডিজিটাল যুগে মানুষের কাছে যে সংবাদটা যাচ্ছে, এর গ্রহণযোগ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ যদি না যায়, মানুষের মধ্যে তাহলে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। অপতথ্য যেন না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার।

ডিজিটাল বাংলাদেশেরও রয়েছে চারটি স্তম্ভ। মানবসম্পদের উন্নয়ন, ডিজিটাল সরকারব্যবস্থা, ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও প্রযুক্তির বহিঃপ্রকাশ। ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ফলে ওই ধারণাটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ; যার মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ স্মার্টের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভও বলা যায়। সুতরাং ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ একে অপরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

মূলত স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে বোঝায়, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনব্যবস্থা। যেখানে সব ধরনের নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে সবকিছুই 'স্মার্টলি' করা যাবে। যে কোনো ভোগান্তি ছাড়া সব নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ।

তথ্যপ্রযুক্তি নিত্যনতুন মাত্রা নিয়ে আসবে। সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংবাদমাধ্যম এবং এতে কর্মরত সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। ডিজিটাইজেশন সাংবাদিকতা প্যাড-কলমের যুগের অবসান ঘটিয়েছে। ডিজিটাল যন্ত্রের ব্যবহার ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন সাংবাদিকতার জন্য এখন অপরিহার্য। প্রচলিত মিডিয়া থেকে বহুগুণ বেশি তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল মিডিয়াকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। তথ্য-উপাত্ত পাঠক ও দর্শকের কাছে অডিয়ো, ভিডিয়ো কিংবা প্রিন্ট ভার্সনে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপনের বিষয়টিও স্মার্ট যুগের সাংবাদিকতার জন্য অবশ্যই চ্যালেঞ্জ এবং তা বড়ো ধরনের।

সর্বজন স্বীকৃত যে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, তথ্যের প্রবেশাধিকার এবং জনগণের ক্ষমতায়ন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একটি নিরাপদ ও মুক্ত গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যম ব্যবস্থাপনা গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারে। এ বাস্তবতা আমাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ও মুক্ত স্বাধীন মতামতভিত্তিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে পাঠককে সত্য ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সাংবাদিকের দায়িত্ব। আমাদের সংবাদমাধ্যমও দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছে সামাজিকভাবে। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই এই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রবলতর করেছে। দুর্নীতিমুক্ত ও সুশীলসমাজ গড়ে তোলার দায়িত্বের মধ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি নিহিত। সংবাদমাধ্যম তথ্যভান্ডার এবং সেই সঙ্গে বিনোদনেরও উৎস।

কাজেই এখানে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে, তা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ; সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। ইচ্ছা করলেই সাংবাদিক যা খুশি তা লিখতে পারেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত ও বিভ্রান্ত করার কোনো অধিকার সাংবাদিক রাখেন না (যদিও বাস্তবে এর উল্টোটি ঘটে অনেক ক্ষেত্রে)। এটা বাস্তব যে, সংবাদমাধ্যম সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে এখনো কাজ করে। একটি অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানমনস্ক; প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ বিনির্মাণে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে সংবাদ প্রকাশের ধারা লেখনীতে ও রিপোর্টিংয়ের ধারায় উন্নীত হতে হবেই। এই ধারা প্রচলনের কাজটা বর্তমান সময়ে চালু করার ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়া দরকার। উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতেই হবে। বিশ্বে চলছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব থেকে বাদ যায়নি বাংলাদেশও। নিজেদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। না হলে ছিটকে পড়তে হবে অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারা থেকে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনটি শিল্পবিপ্লব বদলে দিয়েছে সারা বিশ্বের গতিপথ এবং মানুষের জীবনধারা। এখানেও সংবাদমাধ্যমকে নিজেদের দক্ষতা ও কর্মকৌশলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে।

ডিজিটাইজেশনের কালে দেখা যাচ্ছে যে, দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো সংবাদ পরিবেশনায় নেতিবাচকতার ওপর জোর দিচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের আধেয় বা কনটেন্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক হচ্ছে, কিংবা তা প্রায়ই একই রকম থেকে যাচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ৪৭টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে ২ কোটি ৩০ লাখ শিরোনাম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকরা। ২০০০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত শিরোনামগুলোয় নিহিত ইতিবাচক বা নেতিবাচক সংবেদনশীল ভাবাবেগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বিশাল সংখ্যক এই শিরোনাম বিশ্লেষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে কোন শিরোনামে সংবেদনশীল অনুভূতি নিহিত আছে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, ২০০০ সাল থেকে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের শিরোনামগুলোর নেতিবাচক সেন্টিমেন্ট ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। ইতিবাচক শিরোনামের সংবাদ-শিরোনাম সংখ্যা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। শিরোনামগুলোয় রাগ ও ভয়ের দ্যোতনা যুক্ত করার প্রবণতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এর বিপরীতে আবেগনিরপেক্ষ শিরোনামের অনুপাত কমে যাচ্ছে। গবেষকদের মতে, এটা হওয়ার কারণ হয়তো একটি বৃহত্তর সমাজের মেজাজের প্রতিফলন অথবা কেবলই নিউজরুমের নিজস্ব নীতিকেন্দ্রিক অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশ। তারা এটাও মনে করেন যে, সংবাদপত্র শিল্পের আয় কমে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংবাদে 'ক্লিক' বা 'রেটিং' বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো শিরোনামে ক্রমবর্ধমান নেতিবাচকতা এবং আবেগ ঢেলে দিয়ে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার সত্যভিত্তিক মান থেকে সরে গিয়ে রাজনৈতিক এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যও এ ধরনের শিরোনাম করা হতে পারে। বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমে নেতিবাচক শিরোনামের প্রবণতাও বাড়ছে। এ নিয়ে জরিপ না হলেও পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নেতিবাচক শিরোনাম করা হয় পাঠক বা ভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণে। এ ধারাও ক্রমবর্ধমান।

স্মার্ট গণমাধ্যমকে মোকাবিলা করতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর নতুন প্রযুক্তিগুলো তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের শুদ্ধতার জন্য সম্ভাব্য একটি হুমকি বৈকি। কিন্তু একই সঙ্গে সাংবাদিকতাকে আরও দক্ষ, কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করার অবিশ্বাস্য সুযোগও বটে। এআই ব্যবহারে সময় বেঁচে গেলেও পক্ষপাত ও ভুলের মতো সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে এআই ব্যবহার করে তৈরি প্রতিবেদন একজন মানুষের মাধ্যমে যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এআইকে মানিয়ে নেওয়া নিয়ে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংবাদকক্ষে, সেগুলো বেশ প্রকট। এক্ষেত্রে কারণ হিসাবে দেখানো হয় যে, এআই-এর প্রযুক্তিতে ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রাধান্য রয়েছে। ফলে অন্য ভাষাভাষী দেশগুলো এ প্রযুক্তিকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। সাংবাদিকতায় এআই ব্যবহারে ঝুঁকি ও সম্ভাবনা দুটোই আছে। পেশাগত নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে এআই-এর প্রভাব উদ্‌বেগের কারণ বৈকি। যুক্তরাজ্যে সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ তৈরির কাজে চ্যাট জিপিটি কিংবা গুগল বার্ডের মতো চ্যাটবট ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে ঢালাওভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে না অর্ধেকের বেশি সংবাদপত্র। এমনটা মনে করা হয়, খবরের যথার্থতা, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতাসহ অন্যান্য দিক; সাংবাদিকতার মূল্যবোধের ওপর বুদ্ধিমত্তার পেশাগত নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত প্রভাব উদ্‌বেগের কারণ হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকতা উদ্দীপক ও ভীতিকর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের আরেকটি সময় পার করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বিল গেটস বলেছেন, এআই প্রযুক্তি পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লক্ষ্য। মনে হতে পারে, কৃত্রিমজগতই নিয়ন্ত্রণ করবে সংবাদমাধ্যমকে। এআইকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহারের সক্ষমতা কিংবা অক্ষমতা অনেক কিছুই নির্ধারণ করে দেবে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এআই যদি সাংবাদিকের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে, সংবাদমাধ্যমের সৃজনশীল ও ফরমায়েশি কাজ নিখুঁতভাবে করে দিতে পারে, তবে আগামী দিনের নতুন বিশ্ব কেমন হবে, তা কল্পনা করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে এআই-এর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিকল্প নেই।

স্মার্ট সংবাদমাধ্যম কীভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্মার্ট সংবাদমাধ্যম গড়ে তোলার জন্য আলোচিত সময়কে সামনে নিয়ে এসে আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে সংবাদমাধ্যমকেও।

স্মার্ট সংবাদমাধ্যম গড়ে তুলতে হলে অনেক বাধাবিপত্তিকেও পাড়ি দিতে হবে। প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারকে পুঁজি করে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে গুজব, অপপ্রচার, মিথ্যা, ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এখন অনেক বেশি সহজ। একজন সংবাদকর্মী তাঁর দায়িত্ববোধ থেকেই এই গুজব, মিথ্যা, ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে—এটাই কাম্য। যে কোনো ধারণা প্রতিষ্ঠায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা অনেক বেশি জরুরি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে যেমন, তেমনই গড়তে হবে স্মার্ট গণমাধ্যম। সত্যের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার কাজটিও করতে হবে সংবাদমাধ্যমকে। স্মার্ট বাংলাদেশের সারথির পথে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা বলতে সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকের ভূমিকা অবশ্যই থাকতে হবে। পিছিয়ে থাকার কোনো অবকাশই নেই এক্ষেত্রে। গণমাধ্যমকে অবশ্যই দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে। যাতে থাকছে স্মার্ট সংবাদমাধ্যমও।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

১ জুন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত ছয় সংবাদপত্রকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্তদের সাথে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-এর স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি ও নোয়াব সভাপতি এ কে আজাদ এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ছয় সংবাদপত্রকে সম্মাননা দিল নোয়াব

সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সম্মাননা পেল দেশের ঐতিহ্যবাহী ছয় সংবাদপত্র। ৫০ বছরের বেশি সময় অতিক্রম করে আসা চারটি সংবাদপত্র– সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং ২৫ বছর পূর্ণ করা মানবজমিন ও প্রথম আলোকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

১ জুন রাজধানীর গুলশান ক্লাবে বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি। নোয়াবের সভাপতি এ কে আজাদ এমপির সভাপতিত্বে ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নোয়াবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম।

৫০ বছর পূর্ণ করা পত্রিকার মধ্যে সংবাদের পক্ষে ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, দৈনিক ইত্তেফাকের পক্ষে এর সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, আজাদীর পক্ষে নির্বাহী সম্পাদক শিহাব মালেক, ২৫ বছর পূর্ণ করা মানবজমিনের পক্ষে প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও সম্পাদক মাহবুবা চৌধুরী এবং প্রথম আলোর পক্ষে সম্পাদক মতিউর রহমান সম্মাননা গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, সংবাদের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য নিহাদ কবির ও আজাদীর নির্বাহী সম্পাদক শিহাব মালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশে এর মালিকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জনমত গঠন করা, সামাজিক দায়িত্ব পালন করার মতো মৌলিক দায়িত্ব থেকে সংবাদপত্র যেন দূরে সরে না যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই অগ্রগতিতে তারাও অবদান রাখছেন। সেজন্য তাদের অভিনন্দন।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি বলেন, স্পিকারের উপস্থিতিতে দুজন সম্পাদক অভিযোগ করলেন, স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করা যাচ্ছে না। আপনারা এ কথা বলতে পেরেছেন, এর মানে প্রমাণ হচ্ছে আপনারা মতপ্রকাশ করতে পারেন। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই। তিনি আরও বলেন, আপনারা স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করুন। মুক্ত গণমাধ্যম আমাদের জন্য খুবই দরকার। একই সঙ্গে দরকার অপতথ্য বন্ধ রাখা। তিনি বলেন, আমরা সমালোচনা শুনতে চাই। আমরা চাই এ ধরনের পরিবেশ বজায় থাকুক। তবে তা যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে যে র‍্যাংকিং প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ত্রুটি আছে। র‍্যাংকিংয়ে যেসব তথ্য নেওয়া হয়, সেখানে অনেক ভুল আছে। বিশ্বস্ততার অভাব আছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, মুক্ত সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে রয়েছে। আমরা এখানে চ্যালেঞ্জের কথা অস্বীকার করব না।

মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বলেন, সংবাদপত্রের যাত্রা কঠিন, লড়াইটা আরও কঠিন। বাংলাদেশে অনেক কিছু বলা যায়, আবার অনেক কিছুই বলা যায় না। বলতে গেলেও সমস্যা, না বললেও হয় না। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে পারলেই হয়। কিন্তু আইনকানুন করে সেটা কঠিন করা হয়েছে। সংবাদপত্রকে এসব আইনের মধ্যে না রাখলে কাজ করা সহজ হয়।

প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, দেশে এখন স্বাধীন, দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করা সহজ কথা নয়। তবে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়াই আমাদের দায়িত্ব। আমার সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার ৫২ বছরের। দীর্ঘ এই সাংবাদিকতার সময়ে আমি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পৃক্ত থেকেছি, জাতির জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছি। অনেক ঘটনা, দুর্ঘটনা, ব্যর্থতা এবং সাফল্য রয়েছে। আমাদের দেশে সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটছে, ব্যর্থতাও আছে।

তিনি ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম ছাত্র ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে তখন স্লোগান দিয়েছি 'প্রকৃত গণতন্ত্র চাই, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চাই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'–এরকম আরও অনেক দাবি। আজ ৬২ বছর পরও এটাই সত্য–এখনো একই রকমের দাবি করতে হচ্ছে। এখনো বলতে হচ্ছে–'পূর্ণ গণতন্ত্র চাই, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই, মতপ্রকাশের অধিকার চাই, বিশেষ করে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।' তিনি বলেন, আমরা সবাই দেশের মঙ্গল চাই, বাংলাদেশের জয় চাই।

সভাপতির বক্তব্যে এ কে আজাদ বলেন, আমাদের জন্য উদ্‌বেগের বিষয় হলো, সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ)। নোয়াব এবং সম্পাদক পরিষদ ইতোমধ্যে এটি নিয়ে তাদের উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে। আশা করি, সরকার আমাদের উদ্‌বেগকে আমলে নেবে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকতার সমস্যা সমাধানে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন এমপি, সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও শিল্পপতি তপন চৌধুরী, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীন, বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, শেল্টক্ গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ, বিজিএমইএ-এর সাবেক সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিকস মোলার, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। (সূত্র: ২ জুন ২০২৪, সমকাল)

গণমাধ্যমের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নারী সাংবাদিকের চ্যালেঞ্জও বেড়েছে

গণমাধ্যম আজ শুধু পত্রিকা আর টিভির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অনলাইন নিউজ পোর্টাল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইউটিউব–এমন মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মাধ্যম বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নারী সাংবাদিকদের জন্য চ্যালেঞ্জগুলোও বেড়েছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের মতো সংগঠনকে ভূমিকা রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, নারী সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা যেন ঝরে না পড়েন, সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

২ জুন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এসব কথা বলেন। 'নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে কলম হোক হাতিয়ার' প্রতিপাদ্য করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এ সম্মেলন আয়োজন করে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র-বিএনএসকে।

বিএনএসকের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পারভীন সুলতানা ঝুমা। শোকপ্রস্তাব উপস্থাপন করেন অর্থসম্পাদক আখতার জাহান মালিক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নেতা মনজুরুল আহসান বুলবুল, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন প্রমুখ।

নাসিমুন আরা হক মিনু বিএনএসকের ২৩ বছর অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, তাদের কার্যক্রম ঢাকা থেকে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। নারী সাংবাদিকরা এখন দৃশ্যমান, তারপরও এখনো নারী চাকরি হারান, পেশাগত বৈষম্যের শিকার হন। কোনো ভালো কাজের সুযোগ নারীকে দেওয়া হয় না।

পারভীন সুলতানা ঝুমা বলেন, একটি সৎ ও কর্মতৎপর সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র ২৩ বছর ধরে সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ে কাজ করে চলেছে। তাদের জৌলুস বৃদ্ধি না পেলেও কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। (সূত্র: ৩ জুন ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

ডিআরইউ'র তিন দশকে পদার্পণ উৎসব উদ্‌যাপিত

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্‌যাপন করা হয়েছে পেশাদার সাংবাদিকদের বৃহৎ সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) তিন দশকে পদার্পণ উৎসব। ২৬ মে সকালে ডিআরইউ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এবং কেক কেটে এ উৎসবের উদ্‌বোধন করা হয়। পরে সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি শোভাযাত্রা ডিআরইউ থেকে সেগুনবাগিচার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ২৬ মে ডিআরইউ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২৬ মে ডিআরইউ প্রাঙ্গণে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান সূচনা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি বিশিষ্টজনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে তিনি পায়রা উড়িয়ে উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। এরপর সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ডিআরইউ-এর নসরুল হামিদ মিলনায়তনে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এবং কেক কাটেন।

ডিআরইউ সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা জিএম কাদের এমপি, আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেক কাটেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের এমপি

সাংবাদিকদের প্রাপ্য সব ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি বলেছেন, ডিজিটাল অ্যাক্টের নামে কোনো সাংবাদিক যাতে হয়রানির কিংবা হেনস্তার শিকার না হন, সে ব্যাপারে সরকার সতর্ক আছে এবং থাকবে।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, 'সাংবাদিকতার নামে অপসাংবাদিকতা ও ভুয়া লোক যাতে মহান এ পেশাকে অসম্মান করতে না পারে, সেজন্য সাংবাদিকদেরও সতর্ক থাকতে হবে।' (সূত্র: ২৭ মে ২০২৪, সমকাল ও দৈনিক ইত্তেফাক)

গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা আনার কাজ চলছে

সাংবাদিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা আনার কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমকর্মী আইন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এ আইন পাশ হলে গণমাধ্যমেরও সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। ২৩ মে সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত বিএসআরএফ বার্তার মোড়ক উন্মোচন ও মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ফসিহ উদ্দীন মাহতাব। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি ও 'বিএসআরএফ বার্তা'র সম্পাদক মুন্না রায়হান। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা আনার বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছি। বিষয়টি একটু জটিল। জটিল এ কারণে যে, গণমাধ্যমের প্রচারসংখ্যা নির্ণয় করার যে ফর্মুলা আছে, এর মধ্যেও কিছু গলদ আছে, সেটিকেও ম্যানুপুলেট করা যায়।

তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে ক্রোড়পত্র দিই, তা কিন্তু ডিএফপির লিস্ট দেখে দিচ্ছি না। আমি একটি লিস্ট বানিয়েছি বিশেষ সোর্সের মাধ্যমে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গণমাধ্যমকর্মী আইন পাশ হলে এটি মোটামুটি সবকিছু কাভার করে ফেলবে। কারণ, এখানে অনলাইন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মোটামুটি সবকিছুই কাভার করবে। (সূত্র: ২৪ মে ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধার সঙ্গে হুমকির মুখে সাংবাদিকতা

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা পাচ্ছে জনগণ। তবে এই সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সাংবাদিকতা হুমকির মুখে পড়েছে। সবার হাতে মোবাইল ও ইন্টারনেট পৌঁছে যাওয়ায় তথ্যের অবাধ

২৩ মে সচিবালয়ে বিএসআরএফ বার্তার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি

প্রবাহ দেখা দিয়েছে। যাচাই-বাছাই ছাড়া এসব তথ্য সরবরাহ বা অপপ্রচার বন্ধের উদ্যোগ না নিলে দেশ হুমকির মুখে পড়বে।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে ৩ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন' এ সভার আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, সাংবাদিকদের সব সময় সত্য প্রকাশ করতে হবে। তবে এতে সমাজ ও দেশের যেন ক্ষতি না হয়, সে বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে। শুধু সরকার থেকে নয়, সংবাদপত্রের মালিকপক্ষ থেকেও সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। সাংবাদিক, সম্পাদক ও মালিকপক্ষ একসঙ্গে জনসাধারণের জন্য কাজ করবেন, এই আহ্বান জানাই।

সভাপতির বক্তব্যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, প্রতিবছর ৫০ থেকে ৭০ জন সাংবাদিক মারা যান। ২০২৩ সালে এক বছরে গাজায় ১৫০ সাংবাদিক মারা গেছেন। প্রতিকূলতার মধ্যে সাংবাদিকতার কারণে এ বছর তাঁদের পুরস্কৃত করেছে ইউনেস্কো। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজনীতিকদের সম্পর্ক ভালোবাসা এবং ঘৃণার সম্পর্ক। ক্ষমতায় থাকলে ভালোবাসা এবং ক্ষমতায় না থাকলে ঘৃণা। অপর একটি প্রতিবন্ধকতা হলো আইনের অপপ্রয়োগ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাবেক সহসভাপতি মানিক লাল ঘোষ, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহাবুব উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন এমপি। (সূত্র: ৪ মে ২০২৪, সমকাল)

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হলেন নাঈমুল ইসলাম খান

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান। তিনি দৈনিক 'আমাদের নতুন সময়' পত্রিকার ইমেরিটাস সম্পাদক। ৬ জুন এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নাঈমুল ইসলাম খান

নাঈমুল ইসলাম খানকে সচিব পদমর্যাদায় প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল বা তাঁর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাঁকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগ দেওয়ার সময় থেকে এ মেয়াদ কার্যকর হবে।

নাঈমুল ইসলাম খানের জন্ম কুমিল্লায় ১৯৫৮ সালের ২১ জানুয়ারি। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি বড়ো। কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছেন। ১৯৯০ সালে দৈনিক আজকের কাগজ এবং কিছু পরে দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে দৈনিক আমাদের সময়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে দৈনিক আমাদের নতুন সময়, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি এবং ইংরেজি ভাষার দৈনিক দ্য আওয়ার টাইমসের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান। (সূত্র: ৮ জুন ২০২৪, সমকাল)

গণমাধ্যমবান্ধব আইন প্রণয়নের আহ্বান

পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে গণমাধ্যমের বিশাল ভূমিকা থাকলেও প্রভাবশালীদের তৎপরতায় নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছেন গণমাধ্যমকর্মীরা। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করে মামলারও মুখোমুখি হচ্ছেন তাঁরা। শুধু পরিবেশবিষয়ক নয়, সার্বিকভাবে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন হলেই তাঁদের রক্তচক্ষুর মুখোমুখি হতে হয়। এজন্য সাংবাদিকতা সুরক্ষিত করে এমন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান ৯টি আইন সংশোধন করে গণমাধ্যমবান্ধব করা প্রয়োজন।

৪ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'গ্রহের জন্য গণমাধ্যম: পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় সাংবাদিকতা' শীর্ষক আলোচনাসভায় সম্পাদকসহ বিশিষ্টজন এসব কথা বলেন। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ এই আয়োজন করে।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি। বক্তব্য দেন সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি এ কে আজাদ এমপি, ভোরের কাগজের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ঢাকা ট্রিবিউনের সম্পাদক জাফর সোবহান ও দেশ রূপান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোস্তফা মামুন।

সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পিনাকী রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীন, সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার করিমসহ সাংবাদিকরা।

এতে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি বলেন, 'পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে সাংবাদিকতা, সেই সাংবাদিকতাকে আমরা প্রণোদনা, উৎসাহ, সমর্থন ও সুরক্ষা দিতে চাই। তবে ক্ষেত্রবিশেষ তৃণমূলে বিভিন্ন ধরনের ব্যত্যয় ঘটে।' তিনি শুধু পরিবেশ সুরক্ষা নয়, গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

জাতীয় সংসদ সদস্য ও নোয়াব সভাপতি এ কে আজাদ বলেন, 'দেশে গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা আমাদের উদ্‌বিগ্ন করে তুলছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পথ দিনদিন আরও নিম্নমুখী হচ্ছে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও গোষ্ঠীর চাপে সুস্থ সাংবাদিকতার পথ ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে।' সম্পাদক পরিষদের সহসভাপতি শ্যামল দত্ত বলেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো সংকট পরিবেশ বিপর্যয়। বাংলাদেশে পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে হলে অনেক সংকটের

মুখোমুখি হতে হয়। কারণ, পরিবেশ ধ্বংসকারী অনেকে গণমাধ্যমের মালিক। ঢাকার চারপাশে যারা দখলকারী, তাঁদের প্রায় সবারই মিডিয়া রয়েছে। আবার আইনপ্রণেতারাও পরিবেশদূষণে জড়িত। পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে হলে নানা চ্যালেঞ্জ আসে।'

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'গণমাধ্যমে না এলে আমরা জানতেও পারতাম না, কোথায় কী হচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিকরা, এমনকি পরিবেশ নিয়ে রিপোর্ট করেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা খেয়েছে।'

জাফর সোবহান বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের অনেক কিছু করার আছে। বিশ্বব্যাপী এটি এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ।' মোস্তফা মামুন বলেন, 'পরিবেশ নিয়ে আমাদের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ কম। কারণ, বিষয়টি জনপ্রিয় নয়। আবার পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকতা করতে হলে টেকনিক্যাল অনেক বিষয় জানতে হয়।'

মূল প্রবন্ধে পিনাকী রায় বলেন, 'চামড়াশিল্পের জন্য বুড়িগঙ্গা নদীকে আমরা মেরে ফেলেছি। দেশে কতগুলো নদী আছে, তাও সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়। অনেক নদী খাল হয়ে গেছে। সরকার নদীগুলো রক্ষা করতে পারছে না।'

সভাপতির বক্তব্যে দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, 'দেশে ৯টি আইন আছে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতায় প্রভাবিত করে। কিন্তু সাংবাদিকদের সহায়ক কোনো আইন নেই।' পরিবেশ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করলে কোনো সাংবাদিক হয়রানির শিকার হবেন না–এমন একটা আইন অথবা সরকারি আদেশ জারি করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'পরিবেশ সাংবাদিকতা করে আমরা সরকারের সহায়ক হতে চাই।' (সূত্র: ৫ মে ২০২৪, সমকাল)

সাংবাদিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই হোক মে দিবসের অঙ্গীকার: ডিইউজে

সাংবাদিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই হোক মে দিবসের অঙ্গীকার–এই দাবি ব্যক্ত করে ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন এক বিবৃতি দিয়েছেন। নেতারা বলেন, আজ মহান মে দিবস। যদিও দেশে অন্য পেশাজীবীদের বেতনভাতা বাড়লেও

রাজধানীর একটি হোটেলে ২২ এপ্রিল ইউনিসেফ মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের মাঝে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

সাংবাদিকদের বেতনভাতা বর্তমান বাজারের তুলনায় অনেক কম ও অনিয়মিত।

অন্য সুযোগ-সুবিধায়ও সাংবাদিকরা পিছিয়ে আছেন উল্লেখ করে নেতারা আরও বলেন, সরকারের স্বাধীন সংবাদমাধ্যম নীতি থাকলেও তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অনেকের অনীহা দেখা গেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা শোষণ-বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। সংশ্লিষ্টরা বিষয়গুলো জানলেও এসব ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। একই সঙ্গে নেতারা সাংবাদিকদের সব আইনসংগত অধিকার বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়ার জন্য গণমাধ্যম মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। নেতারা বলেন, এখনো গণমাধ্যমে অনৈতিক ও আইনবহির্ভূতভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে। অবিলম্বে ছাঁটাই বন্ধ ও সাংবাদিকদের পাওনা টাকা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। (সূত্র: ১ মে ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস পেলেন ১৫ সাংবাদিক

শিশু অধিকার নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য অষ্টাদশ 'ইউনিসেফ মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস' পেয়েছেন ১৫ সাংবাদিক। ২২ এপ্রিল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের বিজয়ীরা হলেন প্রিন্ট সাংবাদিকতায় প্রথম আলোর আহমাদুল হাসান, ঢাকা নোটের রবিউল আলম, ঢাকা পোস্টের রাকিবুল হাসান তামিম, মুছা মল্লিক, জসীম উদ্দীন ও নজরুল ইসলাম, প্রতিদিনের বাংলাদেশের সাধন কুমার সরকার, সিভয়েস ২৪ ডটকমের শারমিন রিমা এবং বাংলা ট্রিবিউনের উদিসা ইসলাম।

ভিডিয়ো প্রতিবেদনে যৌথভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের বনি আমিন এবং ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সবুজ মাহমুদ। ফটোসাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর সাজিদ হোসেন। ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু-সাংবাদিকদেরও পুরস্কৃত করা হয়েছে। প্রিন্ট (অনূর্ধ্ব-১৮) ক্যাটাগরিতে ইকোনমিক নিউজ২৪ ডটকমের নাঈম ইসলাম, ভিডিয়ো ক্যাটাগরিতে এটিএন বাংলার মুজাহিদ ইসলাম ও ফটোসাংবাদিকতায় আজকের সুন্দরবনের সাফায়েত হোসেন শান্ত পুরস্কৃত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, শিক্ষাবিদ ও লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। (সূত্র: ২৩ এপ্রিল ২০২৪, সমকাল)

আরবান রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন ছয় সাংবাদিক

নিরাপদ নগর গড়তে বিভিন্ন সেবা সংস্থার মধ্যে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পাশাপাশি জাতিগতভাবে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে, ঢাকামুখী

মানুষের স্রোত থামাতে হবে। তাহলেই এ শহরকে নিরাপদ হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

২২ মে বিকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'নিরাপদ নগর দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও বেস্ট আরবান রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' শীর্ষক এ সভার আয়োজন করে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম।

পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিকরা হলেন নিউ এজের রাশেদ আহমেদ, বণিক বার্তার আল ফাতাহ মামুন, সমকালের অমিতোষ পাল ও লতিফুল ইসলাম, সারাবাংলা ডট নেটের রাজনীন ফারজানা এবং ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের নাজমুল সাঈদ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সাধারণ সম্পাদক শেখ মুহম্মদ মেহেদী আহসান। তিনি ঢাকাকে নিরাপদ নগর হিসাবে গড়ে তুলতে আটটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। এগুলো হলো আইন প্রয়োগ বৃদ্ধি, নগরপরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি, প্রযুক্তির ব্যবহার ও পর্যবেক্ষণ, জনগণকে সম্পৃক্ত করা, শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানো, নীতিমালার পুনর্গঠন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মূলত দুর্নীতি বন্ধ, কঠোর আইনের প্রয়োগ ও দক্ষ বিচারব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকাকে নিরাপদ করা সম্ভব।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, ঢাকায় রাস্তা, গাছ, জলাশয় অনেক কমছে; কিন্তু বাড়ছে মানুষ।

আলোচনাসভায় নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মতিন আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের নগরায়ণ ও পরিবেশ সম্পাদক স্থপতি সুজাউল ইসলাম খান বক্তব্য দেন। (সূত্র: ২৩ মে ২০২৪, প্রথম আলো)

কৃষি সাংবাদিকতা পুরস্কার পেলেন কালের কণ্ঠের মিরাজ

আবুল বাশার মিরাজ

কৃষি প্রযুক্তি প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস) প্রবর্তিত প্রথমবারের মতো কৃষি সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০২৪ পেয়েছেন কৃষিবিদ আবুল বাশার মিরাজ। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (বাকৃবিসাস) সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রায় অর্ধযুগ কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। মিরাজ কালের কণ্ঠের বাকৃবি প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন। ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন কেন্দ্রে পুরস্কার বিতরণ ও বার্ষিক কর্মশালার প্রধান অতিথি সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ড. শামসুল আলম মিরাজের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমদাদুল হক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সি. জাউসিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাউরেসের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহফুজা বেগম। (সূত্র: ২৮ এপ্রিল ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

সভাপতি সম্পাদক

ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিল সভাপতি মুক্তাদির সম্পাদক জাওহার

ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের (ডিএসইসি) দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি মুক্তাদির অনিক ও সাধারণ সম্পাদক পদে জাওহার ইকবাল খান নির্বাচিত হয়েছেন। ৩০ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শেষে রাতে এ ফল ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন সহসভাপতি আলী ইমাম সুমন, যুগ্ম সম্পাদক মনির আহমাদ জারিফ, কোষাধ্যক্ষ নাজিম উদ-দৌলা সাদি, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদ রানা, দপ্তর সম্পাদক জাফরুল আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আরিফ আহমেদ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক তারেক হোসেন বাপ্পি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাহিদ হাসান, কল্যাণ সম্পাদক সাফায়েত হোসেন এবং নারীবিষয়ক সম্পাদক ফারজানা নাজনীন (ফ্লোরা)।

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, শামসুল আলম সেতু, আনজুমান আরা শিল্পী, আনজুমান আরা মুন, জেসমিন জাহান, তানজিমুল নয়ন ও মাশরেকা জাহান নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্র: ১ মে ২০২৪, সমকাল)

সভাপতি সম্পাদক

রিপোর্টার্স ফর রেল অ্যান্ড রোড সভাপতি আনোয়ার সম্পাদক তাওহীদুল

যোগাযোগ খাতের সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফর রেল অ্যান্ড রোডের (আরআরআর) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের সময়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তাওহীদুল ইসলাম।

৩ মে রাজধানীর একটি হোটেলে আরআরআর-এর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা নির্বাচিত হন। কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি পার্থ সারথি দাস (প্রতিদিনের সংবাদ), যুগ্মসম্পাদক শিপন হাবীব (যুগান্তর), অর্থ সম্পাদক শাহিন আক্তার (নিউ এজ), সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন শুভ্র অধিকারী (ডেইলি স্টার); দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম (ডেইলি সান), প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

সম্পাদক তারেক সিকদার (বৈশাখী টিভি), কার্যনির্বাহী সদস্য মুনিমা সুলতানা (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), রাজীব আহাম্মদ (সমকাল) এবং ইবরাহীম মাহমুদ আকাশ (দৈনিক জনকণ্ঠ)।

শামীম রাহমানের (বণিক বার্তা) নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের গবেষণা ও প্রকাশনা সেল গঠন করা হয়েছে। অন্য সদস্যরা হলেন সজীব ঘোষ (কালের কণ্ঠ), আল আমিন সজল (ইনডিপেনডেন্ট টিভি), তৌফিকুল ইসলাম ও তারেক সিকদার। গত বছরের মার্চে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকাভিত্তিক পেশাদার সাংবাদিকদের প্ল্যাটফরম আরআরআর। (সূত্র: ৪ মে ২০২৪, সমকাল)

ইত্তেফাক ডিজিটালের ‘গোল্ডেন প্লে’ বাটন অর্জন

‘ডেইলি ইত্তেফাক’ ইউটিউব চ্যানেল ‘গোল্ডেন প্লে’ বাটন অর্জন করেছে। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশক তারিন হোসেন গোল্ডেন প্লে বাটন আনবক্সিং করেন। ২৭ এপ্রিল ইত্তেফাক ডিজিটাল কর্মীদের নিয়ে ঘরোয়াভাবে তিনি কেক কেটে এই অর্জন উদ্‌যাপন করেন। এ সময় তিনি কর্মীদের উদ্দেশে আরও দর্শক ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জনের জন্য কাজ করার দিকনির্দেশনা দেন।

বর্তমানে ‘ডেইলি ইত্তেফাক’ ইউটিউব চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইবার ১১ লাখ ১৯ হাজার। প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ায় এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় গোল্ডেন প্লে বাটন অর্জন। এর আগে ‘ইত্তেফাক ডিজিটাল’ এবং ‘ডেইলি ইত্তেফাক’ ইউটিউব চ্যানেল দুটি আলাদাভাবে একটি করে ‘সিলভার প্লে’ বাটন অর্জন করে। এটি হলো ইত্তেফাক ডিজিটালের অফিসিয়ালি প্রথম ‘গোল্ডেন প্লে’ বাটন অর্জন। (সূত্র: ২৪ এপ্রিল ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

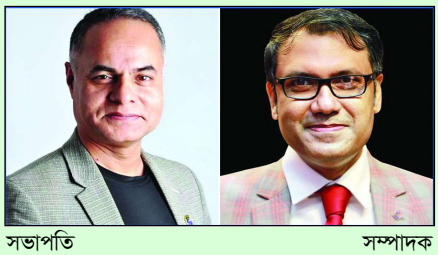

সভাপতি সম্পাদক

ওকাবের সভাপতি মিঠু সম্পাদক জুলহাস

বাংলাদেশে বিদেশি গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ওভারসিজ করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ওকাব) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জার্মান নিউজ এজেন্সির নজরুল ইসলাম মিঠু। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) ব্যুরোপ্রধান জুলহাস আলম।

২৬ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সংগঠনের সাধারণ সভার পর দুই বছর মেয়াদের জন্য তাদের নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ওকাব আহ্বায়ক কাদির কল্লোল।

নবনির্বাচিত কমিটির অন্যরা হলেন সহসভাপতি শফিকুল আলম (এএফপি), যুগ্মসম্পাদক নাইম-উল-করিম (সিনহুয়া) ও কোষাধ্যক্ষ পুলক ঘটক (বেনার নিউজ)।

এছাড়া সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সদস্য হারুন হাবীব, ফরিদ হোসেন, রফিকুর রহমান, পারভীন এফ চৌধুরী, মীর সাব্বির ও কামরান রেজা চৌধুরী কমিটির নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরিচালনা করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শাহজাহান সরদার ও কাদির কল্লোল। (সূত্র: ২৭ এপ্রিল ২০২৪, সমকাল)

২৭ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশক তারিন হোসেন ডিজিটাল কর্মীদের নিয়ে গোল্ডেন প্লে বাটন আনবক্সিং করেন

প্রবীণ সাংবাদিক ফোরামের আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) বাংলা বিভাগের সাবেক বার্তাপ্রধান আমিরুল মোমেনীনকে আহ্বায়ক, সমকালের সাবেক অতিরিক্ত বার্তা-সম্পাদক তপন দাশকে যুগ্ম-আহ্বায়ক ও দৈনিক স্বাধীনমতের প্রধান প্রতিবেদক মনিরুল ইসলাম মানিককে সদস্যসচিব করে ‘প্রবীণ সাংবাদিক ফোরাম’ নামে একটি নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে।

ফোরামের অন্য সদস্যরা হলেন তরুণ তপন চক্রবর্তী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), কামাল চৌধুরী, মুখলেছুর রহমান, মাহমুদুর রহমান খোকন, বরুণ ভৌমিক নয়ন, আতিকুর রহমান চৌধুরী, সাখাওয়াত হোসেন, আজমল হক হেলাল ও শাহ আলম ডাকুয়া। অ্যাডহক কমিটি সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, নিবন্ধন, ষাটোর্ধ্ব সাংবাদিকদের তালিকা সংগ্রহপূর্বক সাধারণ সভা করে নির্বাচনের মাধ্যমে দুই বছর মেয়াদি নির্বাহী কমিটি গঠন করবে। নবগঠিত প্রবীণ সাংবাদিক ফোরামের নেতারা প্রবীণ সাংবাদিকদের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দলমতনির্বিশেষে এক কাতারে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। (সূত্র: ১১ মে ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

সভাপতি সম্পাদক

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সাধারণ সম্পাদক ডিপজল

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে ২০২৪-২৬ মেয়াদের জন্য সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন অভিনেতা মিশা সওদাগর। সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন

অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজল। ২০ এপ্রিল এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

মিশা-ডিপজল ছাড়াও সহসভাপতি পদে জয়লাভ করেছেন মাসুম পারভেজ রুবেল এবং ডিএ তায়েব। সহসাধারণ সম্পাদক পদে জিতেছেন আরমান। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছেন জয় চৌধুরী। আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আলেকজান্ডার বো। দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছেন জ্যাকি আলমগীর। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কলি-নিপুণ প্যানেলের মামনুন ইমন। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন কমল।

এছাড়া কার্যনির্বাহী পরিষদের ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সুচরিতা, রোজিনা, আলীরাজ, সুব্রত, দিলারা ইয়াসমীন, শাহনূর, নানা শাহ, রত্না কবির, চুন্নু এবং কলি-নিপুণ প্যানেলের পলি ও সনি রহমান।

১৯ এপ্রিল সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। চলে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেন ৪৭৫ জন শিল্পী।

এবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ৫৭০ ভোটের মধ্যে ভোট পড়েছে ৪৭৫টি। । (সূত্র: ২০ এপ্রিল ২০২৪, দেশ রূপান্তর)

ফিলিস্তিনি সাংবাদিক শিরিন আবু স্মরণে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে দৃকের আয়োজনে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর সদস্যের হাতে হত্যার শিকার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ স্মরণে আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ মে রাজধানীর পান্থপথে দৃকপাঠ ভবনে 'গাজা হলোকাস্ট: কিলিং দ্য ট্রুথটেলারস' শীর্ষক প্রদর্শনীর সমাপন অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসকে কেন্দ্র করে ৫ মে থেকে শুরু হয় প্রদর্শনীটি। সমাপন অনুষ্ঠানে সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা। শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শিরিন আবু আকলেহর তৃতীয় হত্যা দিবস স্মরণে সাংবাদিকরা শিরিন আবু আকলেহর প্রতিকৃতির সামনে ফুল নিবেদনের পাশাপাশি তাঁদের ক্যামেরা ও মুঠোফোন নামিয়ে রেখে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

সমাপন অনুষ্ঠানে আয়োজকরা বলেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ২০২১ সালের ১১ মে আলজাজিরায় কর্মরত মুক্তিকামী ফিলিস্তিনি সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। ১১ মে এ হত্যার তিন বছর পূর্ণ হলো। গাজায় চলমান ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের বৈশ্বিক দাবির সঙ্গে একাত্মতা জানানোর পাশাপাশি গাজায় নিহত, আহত ও গণহত্যার ময়দানে কর্মরত সাংবাদিকদের শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যেই এ আয়োজন। সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ স্মরণে প্রদর্শনীটিতে এ পর্যন্ত গাজায় নিহত গণমাধ্যমকর্মীদের ছবি ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। ছয়দিনব্যাপী প্রদর্শনীটির কিউরেটর হিসাবে ছিলেন দৃকের এএসএম রেজাউর রহমান। উল্লেখ্য, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধবিরতির জন্য প্রবল আন্দোলন উপেক্ষা করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখন পর্যন্ত অন্তত পক্ষে ১৪৩ জন গণমাধ্যমকর্মীকে কর্মরত অবস্থায় হত্যা করেছে, যে সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়ে এখন পর্যন্ত ৩৬ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ শিশু ও নারী। (সূত্র: ১২ মে ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

পরিবেশ সাংবাদিক হামলা ও হুমকির শিকার হন সারাবিশ্বে ৭০ শতাংশ

বিশ্বের ১২৯টি দেশের ৭০ শতাংশ পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিক হামলা, হুমকি ও চাপের মধ্যে কাজ করেন। ২ মে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো এ তথ্য জানিয়েছে। ৩ মে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে (বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস) উপলক্ষ্যে ইউনেসকো প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিকদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে দুজন শারীরিক সহিংসতার সম্মুখীন হন। ইউনেসকোর মহাপরিচালক অড্রে আজোরে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'চলমান পরিবেশগত সংকট সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যতীত আমরা কখনোই এটি কাটিয়ে ওঠার আশা করতে পারি না।' (সূত্র: ৪ মে ২০২৪, প্রথম আলো)

শোক সংবাদ

জিয়াউল হক

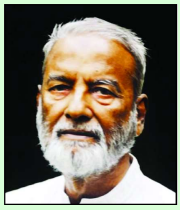

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য ও দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক জিয়াউল হক (৮২) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২৯ এপ্রিল বিকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। জিয়াউল হক দৈনিক পূর্বদেশসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করেছেন।

আফতাব হোসেন

প্রবীণ সাংবাদিক আফতাব হোসেন (৭৭) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৫ এপ্রিল ঢাকায় নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি দীর্ঘদিন দৈনিক ইত্তেফাকে সিনিয়র সাব-এডিটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বাদ এশা ঢাকা কলেজের পাশে অবস্থিত নায়েম মসজিদে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মো. রমিজ খান

কুমিল্লা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও কুমিল্লা জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. রমিজ খান (৬৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি ১৫ এপ্রিল রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ১৬ এপ্রিল সকালে কুমিল্লা প্রেস ক্লাব মাঠে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জোহর নগরীর উত্তর চর্থায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ টমছমব্রিজ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বজলুল করিম সাব্বির

ঝালকাঠির নলছিটি প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বজলুল করিম সাব্বির (৫০)

ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯ মে রাতে মারা যান। ১০ মে সকালে তাঁর মরদেহ নলছিটি শহরের হাইস্কুল রোডের বাসায় নিয়ে আসা হয়। জুমার পর সরকারি নলছিটি মার্চেন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ নান্দিকাঠির পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। বজলুল করিম সাব্বির নলছিটি প্রেস ক্লাবের সভাপতি এনায়েত করিম, এনটিভির সিনিয়র নিউজরুম এডিটর শওকত করিম ও মানবকণ্ঠের সাংবাদিক শাহীন করিমের ভাই।

বিএম গোলাম কাদের

টুঙ্গিপাড়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাকের টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা বিএম গোলাম কাদের (৬৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১১ মে ভোরে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

১০ মে রাতে স্ট্রোকজনিত কারণে অসুস্থ হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে সাংবাদিক গোলাম কাদেরের অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। পরে ভোরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১১ মে বাদ জোহর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

মশিউল হক মিটু

সমকালের নড়াইলের কালিয়া প্রতিনিধি মশিউল হক মিটু (৬২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৮ মে রাতে উপজেলার কলাবাড়িয়া গ্রামের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েক বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

মশিউল হক সমকালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কালিয়া প্রতিনিধি হিসাবে সততা ও সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

আতিকুর রহমান হাবিব

ভোরের কাগজের যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক আতিকুর রহমান হাবিব (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৩ এপ্রিল ভোরে রাজধানীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৫ এপ্রিল আতিকের ব্রেইন টিউমার অপসারণ করা হয়।

২৩ এপ্রিল ভোরের কাগজ কার্যালয়ে দুপুর ১২টায় জানাজা হয়। এরপর জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) জানাজা হয়। পরে বিকালে গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার গারট্ট গ্রামে চতুর্থ জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

আতিকুর রহমান হাবিব ১৯৭৬ সালে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। দৈনিক আল আমিন পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। পরে দৈনিক মানবজমিন, দিনের শেষে ও আজকালের খবর এবং ১০ বছর ধরে ভোরের কাগজে কাজ করছিলেন তিনি।

হোসেনউদ্দীন হোসেন

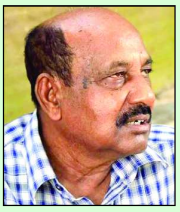

সাংবাদিক হোসেনউদ্দীন হোসেন (৮৩) গুরুতর অসুস্থ হয়ে যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ মে বিকাল ৫টার দিকে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

ইতিহাসবিদ, ঔপন্যাসিক, কবি ও সাংবাদিক হোসেনউদ্দীন হোসেন ১৯৪১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম কলিম উদ্দীন এবং মা মরহুমা আরিছন নেছা।

শৈশবকাল থেকে হোসেনউদ্দীন হোসেন কবিতা লিখতেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে কলকাতার দৈনিক লোকসেবক পত্রিকায় ছোটোদের বিভাগে। এরপর পর্যায়ক্রমে কলকাতা ও ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২০২১ সালে প্রবন্ধ ও গবেষণা ক্যাটাগরিতে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। হোসেনউদ্দীন হোসেনের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭টি।

২০০৬ সালে হোসেনউদ্দীন হোসেনকে ক্যামব্রিজ, ইংল্যান্ড থেকে সেরা ১০০ জন লেখকের একজন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০ সালে বাংলা বিভাগে হোসেনউদ্দীন হোসেনের 'ইঁদুর ও মানুষেরা' উপন্যাসটি এমএ ক্লাসে পাঠ্যসূচি করা হয়।

অলিউল হক রুমি

নীরবে নিভৃতে চলে গেলেন অভিনেতা অলিউল হক রুমি (৬১)। ২২ এপ্রিল ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মূলত বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছিল দুরারোগ্য ক্যানসার। অভিনয়ের পাশাপাশি দীর্ঘদিন তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে গ্রাফিকস ডিজাইনার হিসাবেও কাজ করেছেন।

১৯৮৮ সালে রুমির অভিনয়ের শুরু থিয়েটার বেইলি রোডের 'এখনো ক্রীতদাস' নাটকের মধ্য দিয়ে। একই বছর 'কোন কাননের ফুল' নাটকের মাধ্যমে ছোটো পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর। বর্তমানে তাঁর অভিনীত 'বকুলপুর' নামের একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক দীপ্ত টিভিতে প্রচার হচ্ছে। টেলিভিশনের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সিনেমায়ও। ২০০৯ সালে 'দরিয়া পাড়ের দৌলতি' চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন রুমি। বরগুনায় জন্ম হওয়া রুমি বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় বেশি অভিনয় করেছেন। এ ভাষাতেই তিনি দর্শকদের হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন।

রুমির বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক। মা হামিদা হক। অভিনয়ে তিন দশকের বেশি সময় পার করেছেন রুমি। দীর্ঘ এ পথচলায় অভিনয় করেছেন অসংখ্য নাটক ও সিনেমায়। অভিনয়নৈপুণ্য দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে গেছেন। পর্দায় তাঁর উপস্থিতি বাড়তি আনন্দ দিয়েছে দর্শকদের।

রুমি অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'ঢাকা টু বরিশাল', 'বাপ-বেটা দৌড়ের উপর', 'আমেরিকান সাহেব', 'জার্নি

বাই বাস', 'চৈতা পাগল', 'জীবনের অলিগলি', 'মৈঘে ঢাকা শহর' প্রভৃতি।

২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় রাজধানীর শহীদবাগ এলাকায় প্রথম জানাজা শেষে রুমির মরদেহ গ্রামের বাড়ি বরগুনার বামনায় নেওয়া হয়। সেখানে মায়ের কবরের পাশে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

মোস্তফা রুহুল কুদ্দুস

যশোরের সিনিয়র সাংবাদিক স্থানীয় দৈনিক লোকসমাজের চিফ রিপোর্টার মোস্তফা রুহুল কুদ্দুস (৬৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৪ জুন বেলা সাড়ে ১২টার দিকে যশোর শহরের মোল্লাপাড়ার বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাঁকে যশোর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বারবারা রাশ

হলিউডে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দ্যুতি ছড়ানো অভিনেত্রী বারবারা রাশ (৯৭) মারা গেছেন। ৩১ মার্চ মৃত্যু হয় এই অভিনেত্রীর।

ম্যাগনিফিসেন্ট অবসেশন, বিগার দ্যান লাইফ এবং দ্য ইয়াং ফিলাডেলফিয়ানস-এর মতো ক্ল্যাসিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন বারবারা রাশ। সায়েন্স ফিকশনপ্রেমীরা তাঁকে বিশেষভাবে চেনেন 'হোয়েন ওয়ার্ল্ডস কোলাইড' ও 'ইট কেম ফ্রম আউটার স্পেস' চলচ্চিত্রের জন্য।

একাধিক কালজয়ী ও ব্যাবসাসফল সিনেমা উপহার দিলেও বারবারা রাশকে অস্কার কিংবা এমি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন করা হয়নি কখনোই। তবে ১৯৫৪ সালে 'ইট কেম ফ্রম আউটার স্পেস' চলচ্চিত্রের জন্য তাঁকে গোল্ডেন গ্লোব দেওয়া হয়েছিল।

বার্নার্ড হিল

'টাইটানিক', 'দ্য লর্ড অব দ্য রিংস'খ্যাত অভিনেতা বার্নার্ড হিল (৭৯) মারা গেছেন। হিলের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর মুখপাত্র লউ কৌলসন। তিনি জানিয়েছেন, ৫ মে ভোরে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার।

১৯৯৭ সালে জেমস ক্যামেরনের 'টাইটানিক' সিনেমায় ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড জে স্মিথ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিতি পান বার্নার্ড হিল। তাঁর অভিনয় ঐতিহাসিক ওই চরিত্রে আলাদা গভীরতা যোগ করে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি একজন ক্যাপ্টেনের উদারতা ও করুণ দিক ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে তিনি নজর কাড়েন পিটার জ্যাকসনের 'দ্য লর্ড অব দ্য রিংস' ট্রিলজিতেও। সেখানে রোহানের রাজা থিওডেনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় হিলকে। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল হলিউড ছবি 'ফরএভার নাও'-এ। বার্নার্ড হিল ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। বিবিসি টিভির জনপ্রিয় ড্রামা 'বয়েজ ফ্রম দ্য ব্ল্যাকস্টাফ'-এ ইয়োসের হিউজের চরিত্রে অভিনয় করেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনে একাধিক ঘরানায় বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বার্নার্ড একমাত্র অভিনেতা, যাঁর একাধিক সিনেমা ১১টি একাডেমি পুরস্কার জিতেছিল। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও থিয়েটারে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার ছিল তাঁর।

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

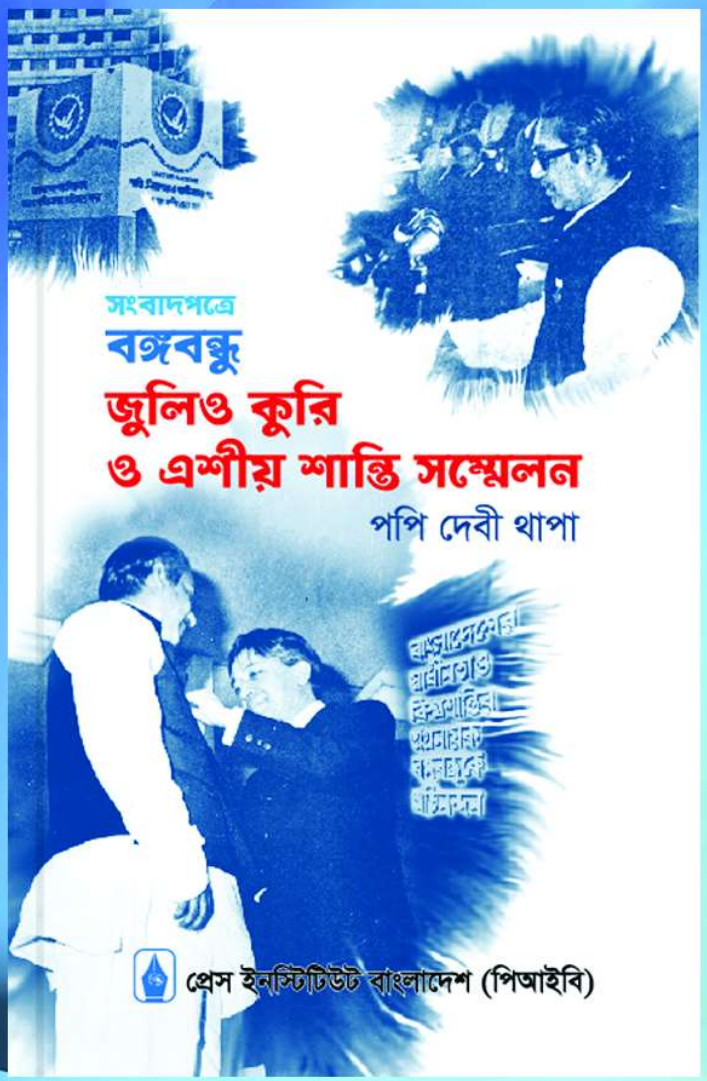

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৮ মে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পিআইবি'র মহাপরিচালকের শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক পদে চতুর্থ মেয়াদে পুনঃনিয়োগ পাওয়ায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন পিআইবি মহাপরিচালক একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও কবি জাফর ওয়াজেদ। ৮ মে বিকালে তিনি বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) চলতি দায়িত্ব মো. জাকির হোসেন, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. কামরুল হক ও নির্বাহী অফিসার (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন চৌধুরীসহ পিআইবির কর্মকর্তারা।

৭ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক হিসাবে টানা চতুর্থবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ। জাফর ওয়াজেদ ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল পিআইবির মহাপরিচালক পদে প্রথম নিয়োগ পান। ২০২১ সালের ২০ এপ্রিল নিয়োগের মেয়াদ শেষ হলে তাঁকে আরও দুই বছরের জন্য একই পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল তাঁকে পুনরায় এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এবার তিনি চতুর্থবার নিয়োগ পেলেন।

জাফর ওয়াজেদের সাংবাদিকতা শুরু সংবাদে। তিনি সংবাদের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ও বাংলাবাজার পত্রিকা এবং দৈনিক মুক্তকণ্ঠের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। সবশেষ তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

জাতির পিতার সমাধিতে পিআইবির মহাপরিচালকের শ্রদ্ধা নিবেদন

চতুর্থ মেয়াদে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ।

১৮ মে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে তিনি বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে পবিত্র ফাতেহা ও দরুদ পাঠ শেষে তিনি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারে নিহত সব শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনায়, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সব শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনায় এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেন।

এ সময় পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) চলতি দায়িত্ব মো. জাকির হোসেন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈকত

১৮ মে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র পরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসেনসহ অন্যান্যরা

১৪ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে 'গুজব প্রতিরোধে প্রচারাভিযান: তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ পর্যালোচনা, বাংলাদেশের তিন জেলায় পরিচালিত গবেষণার তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে ও পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

রায়হান, প্রেস ক্লাব গোপালগঞ্জের মহাসচিব সৈয়দ মিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক শৈলেন্দ্রনাথ, সাইফুল রশিদ চৌধুরী, কবির মাহমুদ, মেহেদী হাসান, প্রেস ক্লাব গোপালগঞ্জের সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম সাইফুর রহমান, ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক এমটি রহমান মাহমুদ, টুঙ্গিপাড়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. তরিকুল ইসলাম, অর্থবিষয়ক সম্পাদক ফারহান লাবিব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি বঙ্গবন্ধু ভবনে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য লিখে সেখানে স্বাক্ষর করেন। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের কিউরেটর মো. নুরুল ইসলাম ও লাইব্রেরির ইনচার্জের হাতে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রকাশিত বেশকিছু বই বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগারে উপহার দেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিকদের কল্যাণে ও অপসাংবাদিকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিরলস-ভাবে কাজ করা এবং বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত রাখতে টানা চতুর্থবার তাঁকে ওই পদে পুনঃনিয়োগ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সবার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এরপর বিকাল ৫টায় গোপালগঞ্জ লেকপাড়সংলগ্ন রক্তকবরী মঞ্চে বিশিষ্ট কবি ও লেখক মিন্টু হক সম্পাদিত 'কাশবন সাহিত্য পত্রিকা' শিল্প-সাহিত্য আড্ডায় তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা জরুরি

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেছেন, গুজব প্রতিরোধে প্রথমত জনসচেতনতা দরকার। কারণ, ইদানীং সবচেয়ে বেশি গুজব ছড়ানো হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অসম্পাদিত মাধ্যম। একে সংবাদমাধ্যম হিসাবে গণ্য করা যায় না। তাই গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্তির কারণে শিশুর সুকুমারবৃত্তি প্রস্ফুটিত হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় পত্রিকাগুলো ফ্যাক্ট চেক সম্পর্কে এখনো তেমন একটা অবগত নয়।

১৪ মে পিআইবির সেমিনার কক্ষে 'গুজব প্রতিরোধে প্রচারাভিযান: তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ পর্যালোচনা, বাংলাদেশের তিন জেলায় পরিচালিত গবেষণার তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (সাকমিড) ও পিআইবি যৌথভাবে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনশীল। বর্তমানে ফেক নিউজ, মিস ইনফরমেশন, ম্যাল ইনফরমেশনের মতো শব্দ নতুন সংযোজিত হলেও আগে সেটা ভিন্ন নামে, যেমন: তথ্য ও অপতথ্য নামে পরিচিতি ছিল। তিনি বলেন সংবাদ মানে অনেক তথ্যের সমষ্টি। এছাড়া তিনি অনলাইনে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে গুজব রটানোর কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেন।

সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (সাকমিড)-এর অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক সৈয়দ কামরুল হাসান আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বলেন, গুজব প্রতিরোধে মাল্টি স্টেকহোল্ডার সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় সমাজে মানুষের ব্যবহার পরিবর্তন হয়ে যাবে।

জাফর ওয়াজেদ

পুনরায় পিআইবি'র মহাপরিচালক হলেন জাফর ওয়াজেদ

৭ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক হিসাবে টানা চতুর্থবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ।

জাফর ওয়াজেদ ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল পিআইবির মহাপরিচালক পদে প্রথমবার নিয়োগ পান। ২০২১ সালের ২০ এপ্রিল নিয়োগের মেয়াদ শেষ হলে তাঁকে আরও দুই বছরের জন্য একই পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল তাঁকে তৃতীয়বার এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এবার তিনি চতুর্থবার নিয়োগ পেলেন।

জাফর ওয়াজেদের সাংবাদিকতা শুরু সংবাদে। তিনি সংবাদের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ও বাংলাবাজার পত্রিকা এবং দৈনিক মুক্তকণ্ঠের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। সবশেষ তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

সাকমিড-এর কনসালটেন্ট ড. শেখ শফিউল ইসলাম বলেন, সরকারের পাশাপাশি সাকমিড-এর মতো কয়েকটি দায়িত্বশীল সংস্থা যেমন: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পুলিশ, পিআইবি সমাজের নানা স্তরে গুজব প্রতিরোধের জন্য অংশগ্রহণমূলক নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। কয়েকটি দাতা সংস্থাও এ ব্যাপারে তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে।

গোলটেবিল বৈঠকে পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন বলেন, ফেসবুক, ইউটিউবসহ অন্যান্য সামাজিকমাধ্যম মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে। সেখানে যে যেভাবে পারে সেভাবে কনটেন্ট সরবরাহ করে। তিনি বলেন, মানুষ একটি ইতিবাচক দিক শুনতে কিংবা দেখতে চাইলে অন্তত পক্ষে ১৭টি নেতিবাচক বিষয় শুনতে বা দেখতে হয়।

বৈঠকে ঢাকা মেইলের সিনিয়র প্রতিবেদক মো. বুরহানউদ্দীন বলেন, ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য এ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগ, ছবি ও ভিডিয়ো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে উত্তরণের জন্য সচেতনতার পাশাপাশি মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।

কালের কণ্ঠের সিনিয়র সাংবাদিক নিখিল ভদ্র বলেন, ফেক নিউজ যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটা সত্য যাচাই করার অন্যতম মাধ্যম।

বুম বাংলাদেশের সম্পাদক আমির শাকির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার ও এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি গণমাধ্যম ও সামাজিকমাধ্যমের পার্থক্য তুলে ধরেন। কীভাবে তথ্যকে বাছাই করা, এককথায় ফিল্টারিং করা যায়, সেটা নিয়ে আলোকপাত করেন।

গোলটেবিল বৈঠকে তিনটি জেলার ওপর চালানো জরিপের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন মাহবুবা আহমেদ রোজি। তিনি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সংখ্যা, ব্যবহারের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, সাকমিড সম্প্রতি দেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৪০০ জনের ওপর জরিপ, ৩০ জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং ৬টি দলগত আলোচনার আয়োজন করেছে। এ তিনটি জেলায় এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য, অপতথ্য এবং কীভাবে গুজব ছড়ায়, কারা গুজব ছড়ায়, কী ধরনের গুজব ছড়ায়–এসব থেকে পরিত্রাণের বিষয়ে সাকমিড কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে গণমাধ্যম সাক্ষরতা বৃদ্ধি, নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পাদন করেছে। গোলটেবিল বৈঠকে সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, আইনজীবী, মসজিদের ইমাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন অংশগ্রহণ করেন।

১৬ মে পিআইবিতে ফরিদপুর জেলার সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট সায়েম খান

সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা চ্যালেঞ্জের মুখে

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা চ্যালেঞ্জের মুখে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট সায়েম খান।

১৬ মে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে ফরিদপুর জেলার সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সায়েম খান বলেন, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এটি অসম্পাদিত মাধ্যম হওয়ায় অবাধ তথ্য প্রদান করে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করছে। জনমানুষের আস্থা হারাচ্ছে। এর পাশাপাশি গণমাধ্যমগুলো তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে গণমাধ্যমগুলো অনেক সময় সত্য-মিথ্যা, এককথায় ক্রস চেক না করে সংবাদ পরিবেশন করছে; যা সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

প্রধান অতিথি আরও বলেন, সাংবাদিকরা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাস অনেক পুরোনো। ইতিহাসের সেই ধারা ও পুনর্লিখন উন্নয়নে কাজ করতে হবে সংবাদকর্মীদের। কারণ, সংবাদকর্মী হিসাবে নিজেকে যুগোপযোগী করে তৈরি করতে না পারলে বর্তমান সময়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর আলোকপাত করেন তিনি। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নির্মাণের চলমান কাজ শেষ করতে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের গবেষক মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন রেজা, পিআইবির প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ শাহ আলম। ফরিদপুর জেলার সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার ২৮ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

তথ্যের সঠিক ব্যবহার প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে

তথ্যের সঠিক ব্যবহার প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এর অপব্যবহার প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। এজন্য যার যার অবস্থান থেকে সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য সরবরাহ করা উচিত। যাতে অপতথ্যের মধ্যে মানুষ প্রবেশ না করে। সমাজে উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলেও সঠিক তথ্যের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

২১ মে পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণে সভাপ্রধানের বক্তব্য রাখছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. কাউসার আহাম্মদসহ অন্যান্যরা

২১ মে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণে সভাপ্রধানের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন ।

প্রশিক্ষণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. কাউসার আহাম্মদ সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণ সেশনে তথ্য অধিকার কী এবং কেন, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর প্রয়োগ বিশ্লেষণ এবং তথ্য অধিকার আইনে নাগরিকের অধিকার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা হয়। পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হক এবং নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন চৌধুরী। প্রশিক্ষণে পিআইবির ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

জয়পুরহাটে বেসিক জার্নালিজম প্রশিক্ষণ

জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ২৫-২৭ মে তিনদিনব্যাপী বেসিক জার্নালিজম প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন জয়পুরহাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সাইফুল ইসলাম। সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন জয়পুরহাট সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম সুলায়মান আলী। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে ৩৫ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ফ্যাক্ট চেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ফ্যাক্ট চেক নিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যরা। পিআইবি আয়োজিত তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী বক্তৃতায় সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

২৯ মে পিআইবির সেমিনার কক্ষে ডিআরইউ সদস্যদের নিয়ে তিনদিনের 'সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ফ্যাক্ট চেক' বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি শ্যামল দত্ত বলেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সাংবাদিকদের তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান আহরণের বিকল্প নেই। নতুবা চ্যালেঞ্জিং এ পেশা থেকে ছিটকে পড়তে হবে। এরই অনুষঙ্গ হিসাবে ফ্যাক্ট চেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, ফ্যাক্ট চেকের মাধ্যমে শনাক্ত করতে হবে তথ্যের সত্য-মিথ্যার পরিধি।

তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যমে ক্রস চেক না করে কোনো সংবাদ প্রকাশ অনুচিত। সংবাদ প্রকাশ বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতিনিয়তই নানারকম বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাই খবর উপস্থাপনে ক্রস চেকের বিষয়ে ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকদের আরও সুদক্ষ হতে হবে, দায়িত্ব পালন করতে হবে।

জাফর ওয়াজেদ আরও বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে প্রযুক্তিজ্ঞানই মূল চালিকাশক্তি। তাই ডিআরইউ সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আইসিটি বিষয়ে লেখার ভাষা হবে সহজ ও নমনীয়, যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে। দৈনিক পত্রিকার শুধু নির্দিষ্ট স্থানজুড়ে বা সপ্তাহে একদিন নয়, প্রতিদিনের বিশেষ অংশে তথ্যপ্রযুক্তির খবর জানানো উচিত।

সমাপন অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তি সম্পাদক রাশিম মোল্লা বক্তৃতা করেন। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়।

২৫-২৭ মে জয়পুরহাট সাংবাদিকদের বেসিক জার্নালিজম প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন জয়পুরহাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিআইবি'র প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ শাহ আলম

২৯ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ফ্যাক্ট চেক বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং সভাপ্রধানের বক্তব্য রাখেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

মোবাইল জার্নালিজমের গুরুত্ব অপরিসীম

বর্তমান সময়ে মোবাইল জার্নালিজমের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গণমাধ্যমের ধরন পরিবর্তন হওয়ায় মোবাইল জার্নালিজমের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকার।

৩১ মে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল জার্নালিজম ট্রেনিংয়ের সমাপনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, গণমাধ্যমের পরিবর্তনের দিগন্ত অনেক বিস্তৃত। কারণ অনলাইন, অডিয়ো, ভিডিয়ো–সবকিছুই এক প্ল্যাটফরমে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। তাই তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।

বিভুরঞ্জন আরও বলেন, অপসাংবাদিকতা, উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রচার করা এবং ভুল সংবাদ পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকা একজন গণমাধ্যমকর্মীর প্রধান দায়িত্ব। তাই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কাজ করতে হবে সাংবাদিকদের।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সংবাদকর্মীদের খাপ খাওয়ানোর ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, দক্ষতার বিকল্প কিছু নেই। তাই আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত করা একজন সাংবাদিকের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে ২৮ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

৩১ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে সাংবাদিকদের মোবাইল জার্নালিজম ট্রেনিংয়ের সমাপনে প্রধান অতিথি ছিলেন আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকার এবং বক্তব্য দিচ্ছেন সভাপ্রধান পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে মোবাইল জার্নালিজম প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য ০৩-০৫ জুন তিনদিনব্যাপী মোবাইল জার্নালিজম প্রশিক্ষণের সমাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ এর সম্পাদক রুশো মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহউদ্দিন মো. রেজা। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

০২ জুন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য পিআইবি আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এনামুল হক চৌধুরী, সভাপ্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহউদ্দিন মো. রেজা

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য ৩১ মে-০২ জুন তিনদিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এনামুল হক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহউদ্দিন মো. রেজা। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।